বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-পরিষদ্-গ্রন্থমালা—প্রথম সংখ্যা



সনাতন হিন্দু

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
প্রাচ্য-বিদ্যাবিভাগের অধ্যক্ষ,
কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাপ্তিস্থান
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য—১।০

প্রকাশক—
শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ,
সম্পাদক, বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-পরিষৎ,
২ বি অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায় লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

মাঘ—১৩৩৭

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা

বাঙ্গালা সন ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার আহ্বানে আমি ময়মনসিংহ হিন্দু-সম্মেলনে সভাপতিরূপে যোগদান করি। পরিমিত-সংখ্যক হিন্দু ভূম্যধিকারী ও মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হিন্দু পল্লী ছাড়িয়া দিলে ময়মনসিংহ এখন জনসংখ্যানুসারে মুসলমান জিলা। কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই হিন্দু-বহুল ময়মনসিংহের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এ হিসাবে ময়মনসিংহ সারা বাঙ্গলাদেশের একপ্রকার নিদর্শন বলিলেই হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বভাবতঃই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়—শুদ্ধির দ্বারা অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত কি না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজভুক্ত হইলেও দুঃসাহসে ভর করিয়া আমি শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা ইহাই আমার অভিভাষণে প্রতিপাদন করি যে—হিন্দু ধর্ম্ম ও আচারে শ্রদ্ধালু ভগবদ্‌ভক্ত অহিন্দুগণের হিন্দুসমাজে প্রবেশ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সকল প্রদেশেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তদবধি গত তিন বৎসর তথাকথিত "সনাতনী" সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আমার এই মতবাদের প্রতিকূলে নানাকারে আন্দোলন চলিয়াছে। কাশীধামে ১৩৩৫ সালে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-সম্মেলন এই আন্দোলনের একটী অভিব্যক্তি। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে আমি পাঁচটী হিন্দুসম্মেলনে বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যায় আমার বক্তব্য উত্তরোত্তর স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করি। আমার মতবাদের বিরোধী সম্প্রদায়ের নেতা হয়েন—বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন। "বসুমতী" মাসিক পত্রিকায় "শাস্ত্র-সমস্যা"

শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধরাজিতে আমি যে তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতেছিলাম—তাহা খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" নামে তিনি কতকগুলি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন—তাহাতে তাঁহার প্রতিপাদ্য ইহাই ছিল যে, আমার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা অকারাদি ক্ষকারান্ত-ক্রমে ভ্রম ও বিপ্রলিপ্সা-প্রসূত। সুতরাং এ জাতীয় বিচারের সত্বরই অবসান হয়। এই "বিচার" প্রসঙ্গে লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিও এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের প্রতিবাদগুলি আমার মূলপ্রবন্ধসমূহ হইতে পৃথক্ হইলেও, যাহাতে উহাদের প্রতিপাদ্য সহজে বুঝা যায়, সেই ভাবে ঐগুলির সমাবেশ এবং অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন এই গ্রন্থে করা হইয়াছে।

এই সম্মিলিত অভিভাষণ ও প্রবন্ধগুলি **সনাতন হিন্দু** নামে বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-পরিষদ্-গ্রন্থমালার প্রথমসংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল। এরূপ নামকরণের প্রয়োজনও আছে। এই গ্রন্থে নিবদ্ধ সকল রচনার মধ্যে শুধু—যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু কোন্ প্রণালী অবলম্বনে নিজ অসাধারণ সত্তাকে বজায় রাখিয়াছে ও সনাতন হইয়াছে—তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে এবং তাহার সমর্থনে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনগ্রন্থ হইতে প্রতিপদে যুক্তি ও প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দুইটী মূল তত্ত্ব প্রকট হয়। প্রথম—হিন্দুসমাজ চির পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তনীয়, সেই জন্যই ইহা সনাতন। দ্বিতীয়—কাল, অবস্থা ও পাত্রানুসারে নূতন ব্যবস্থা করিবার স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতা ইহার নেতৃবর্গের চিরকালই ছিল এবং এখনও আছে। এই দুই তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুসমাজ-সৌধ অগণিত ঝঞ্ঝাবাত্যা সহিয়া, রাষ্ট্রবিপ্লব, বৈদেশিক আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক উৎপাত-সমূহের মাঝে স্মরণাতীত যুগ হইতে এই

ভারতবর্ষে নিজেকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই তত্ত্বের প্রমাণ—হিন্দু-মনীষা হইতে উদ্ভূত সকল শাস্ত্র ও সাহিত্য, ইতিহাস, প্রথা, আচার ও সমাজব্যবস্থা, শিল্প-কলা ও দর্শন। সনাতনী দলের বিদ্বান্ নেতৃবৃন্দ এ তত্ত্ব যে পরিজ্ঞাত নহেন তাহা নহে, তথাপি তাঁহারা শুধু কথার ফেরে ইহা উড়াইয়া দিতে চাহেন।

সম্প্রতি ইহার একটী দৃষ্টান্ত সাধারণসমক্ষে পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি ঐতিহাসিক-প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয় এককালে বঙ্গদেশ যে বৌদ্ধপ্লাবিত হইয়াছিল এবং পরে কালক্রমে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহিত, বৌদ্ধসমাজের নানাশ্রেণী আনুগত্যের দ্বারা বর্ণাশ্রমী সমাজে স্থান পাইয়াছিল—ইহা পরিষদের এক বার্ষিক অভিভাষণে ইতিহাসের প্রমাণ-বলে স্থাপন করেন। ইহা সত্য হইলে, বিপুলভাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে শুদ্ধি প্রচলিত ছিল, তাহাই অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক যুক্তির সমাবেশ ও উপেক্ষণীয় নহে। জাতি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়—এই মতের পরিপোষক সনাতনী দল শাস্ত্রিমহাশয়ের এই সিদ্ধান্তে বড়ই বিষম সমস্যায় পড়িয়া যান। তাঁহাদের অন্যতম নেতা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি পরে ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি প্রতিবাদ অপেক্ষা প্রতিবাক্য নামেরই যোগ্য। উহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধভাবে আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—বৌদ্ধসমাজী হিন্দু হইয়াছে ইহা না বলিয়া, বৌদ্ধ-প্রভাবিত হিন্দুসন্তানই পুনরায় স্বসমাজে ফিরিয়াছে—এইরূপ বলাই সঙ্গত নহে কি? এরূপ বাক্‌চাতুরীদ্বারা সনাতনী দলের মুখরক্ষা হয় কিরূপে—তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কারণ, বহু শতাব্দী ধরিয়া যাহারা ভিন্ন ধর্ম্ম ও আচার পালন করিয়াছে, তাহারা যদি হিন্দুসমাজে পুনরপি স্থান পাইল—তাহা হইলে শুদ্ধি বলিতে আর বাকী রহিল কি?

ইংরাজী আমলের পূর্ব্বে, এমন কি সিপাহী বিদ্রোহের পরও বহুকাল, ভারতের নানাপ্রদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক একাত্মতা-বোধ ছিল। তখন রেল বা তার ছিল না, ইংরাজী ভাষার চলন ছিল না, সমগ্র ভারত এক-রাষ্ট্রীয় ভাবাপন্নও ছিল না। না থাকিলেও, একতা-বন্ধনের অন্যপ্রকার শৃঙ্খলা ছিল। তীর্থযাত্রা ছিল—যোগ ও মেলায় একত্র সমাবেশ ছিল—দেবভাষায় ভারতের বিদ্বৎসমাজে ভাবের বিনিময় ছিল—একই দেবদেবীর উপাসনা ছিল—সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রণালী সকল প্রদেশের পণ্ডিতগণের অভ্যস্ত ছিল—একই প্রকারের আদর্শ ও আচারানুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগের আকর্ষণ ছিল। এইভাবে বিশাল ভারতে হিন্দুর সহিত হিন্দুর ভ্রাতৃভাব, সমপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ হইত। জীবনের পূর্ব্বাহ্নে বারাণসী-পদবাহিনী জাহ্নবীর তীরস্থ আশ্রমে ভারতের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের হরিহর-মূর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের পাদমূলে বসিয়া যখন শাস্ত্রের আলোচনা করিতাম, তখন হিন্দুজাতির এই এক-প্রাণতার—ভারতের এই মিলনসূত্রের ছবি কতবার উজ্জ্বলভাবে মানস-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই বিরক্ত পুরুষের মধ্যে যে স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম দেখিয়াছি—তাঁহার আচরণে যে নির্ভীকতা, যে স্বাধীনতাস্পৃহার আস্বাদ পাইয়াছি—তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহার শাস্ত্রে নিষ্ঠা, অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকতার তলে দেশ ও জাতির প্রতি যে কত গভীর অনুরাগ ছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে সঙ্ঘশক্তির উজ্জীবনের চেষ্টা দেখিয়া প্রায়ই তাঁহার চরিত্রের এই ভাবুকতার দিক্ মনে পড়ে।

আজ হিন্দুজাতির মধ্যে সংগঠিত—সংঘবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা আবার ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে জীবের প্রথম ও প্রধান ইচ্ছা, বাঁচিবার

ইচ্ছা - জাতিহিসাবে, সম্প্রদায়হিসাবে আত্মরক্ষার বাসনা। সে বাসনার সফলতার একমাত্র উপায় ঐক্য—মিলন। এই সময়ে যাঁহারা ঐহিক উন্নতি ও পারত্রিক কল্যাণের পথে এই নবজাগ্রত প্রাচীন জাতিকে পরিচালিত করিবেন, তাঁহাদের নিপুণভাবে মনুষ্যপ্রকৃতি ও হিন্দুজাতির প্রকৃতির অনুধাবন করা একান্ত কর্ত্তব্য। মানুষের সত্তা কেবল ভৌতিক নহে—কেবল আধ্যাত্মিকও নহে। শুধু অন্নেই মানুষ বাঁচে না—শুধু মননেও তাহার প্রাণ থাকে না। মনুষ্যের এই স্থূল সূক্ষ্মে জড়িত জীবন—পার্থিব ও অপার্থিবে মিলিত এই মনোবৃত্তির বিষয় যথাযথ উপলব্ধি না করিয়া—যাঁহারা সমাজকে সংহত ও সমৃদ্ধ করিতে চান, তাঁহাদের সত্যদর্শিতা একান্ত সন্দেহের বিষয়। তবে ইহা স্থির যে, শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টির পরিধি এত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই জন্য শাস্ত্রীয় নিষেধের পদে পদে এত প্রতিপ্রসব, বিধানের এত অনুকল্প, সামর্থ্য ও অবস্থানুযায়ী এত তারতম্য, এত অধিকারিভেদ। এই সনাতন সত্যকে উপেক্ষা করিয়া, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যবস্থাপকগণ গুণ, কর্ম্ম, শক্তি ও অন্তর্নিহিত সংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া, সকল হিন্দু শ্রেণীকেই দুঃসাধ্য ও ক্রমশঃ পরিত্যজ্যমান স্মার্ত্ত আচার ও ব্যবস্থার নিগড়ে দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ দিকে যে সকল শ্রেণীর মধ্যে সেদিন পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে সহজ-পালনীয় আচার প্রচলিত ছিল—তাহারাও, স্মার্ত্ত ব্যবস্থার অনুকরণের চাপে পড়িয়া, সে সকল ত্যাগ করিতেছে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন—ইতর জনও তাহা পালন করে। কিন্তু ইহার ফলে প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-লাভ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ শাস্ত্রকারগণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। কিন্তু এই নিবৃত্তির পথ কাহারও

পক্ষেই সুগম নহে—এমন কি সমাজের শিরোমণি-স্বরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পক্ষেও নহে। কিন্তু প্রকৃত নিবৃত্তি না থাকিলেও, তাহার অভিমান আছে—তাহার বাহ্যশোভা রক্ষা করা আছে। ইহারই নাম মিথ্যাচার। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার ও আচারের ব্যবস্থার তারতম্য শাস্ত্রেই দেখা যায়। আবার এই তারতম্যের সামাজিক প্রথা ও আচারের ভিতর যেরূপ পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাতে যে দুর্নীতি বা দুশ্চরিত্রতা একের পক্ষে মার্জনীয় ব্যসন মাত্র—অন্যের পক্ষে তাহা সর্ব্বনাশকর মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ ব্যবস্থায় প্রবলপক্ষের প্রবৃত্তি সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা নিগৃহীত হইবে—এরূপ মনে করা ভ্রম মাত্র। কার্য্যতঃ ও সেরূপ দেখা যায় না। ফলে ধর্ম্ম বস্তুটী চিত্তকে অধিকার করিয়া স্বতঃ স্ফূর্ত্তি না পাইয়া, অধর্ম্মের গোপনেই পর্য্যবসিত ও পর্য্যাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের নৈতিক অবস্থার ইহাই যথার্থ বিবরণ। সনাতনী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজকে উন্নত ও সংস্কৃত করিবার প্রণালী ইহারই অনুরূপ। এবং ইহার ফলেই হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ সংখ্যায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল—অন্তরে বিদ্বেষ ও কলহে জর্জরিত হইতেছে।

যাহা হউক এই গ্রন্থে নিবদ্ধ প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলির স্বরূপের অধিক পূর্ব্বাভাষ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু গ্রন্থের নামকরণ-প্রসঙ্গে যাহা উল্লেখযোগ্য, তাহাই এখানে বিবৃত হইল। হিন্দুসমাজ পুনরপি উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া বিশ্বের বরণীয় জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায্য স্থান অধিকার করুক—ইহা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানেরই কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু চারিদিকে যে জড়তা, ঔদাসীন্য, গতানুগতিকতা, সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষণ প্রভৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় ঐশ্বরী শক্তি—শ্রীভগবদবতার

ব্যতিরেকে এই বিশাল, প্রাচীন, আত্মবিস্মৃত ও সহস্রধা-বিচ্ছিন্ন সমাজের বর্ত্তমান ভয়াবহ অবস্থার পরিবর্ত্তন মনুষ্যের সাধ্য নহে। আজ ভারতের কোটি কোটি প্রাণীর অন্তঃস্থল হইতে কাতর প্রার্থনা উৎসারিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন—যেরূপ প্রার্থনা ভারতের চিরপ্রথিত ভক্তপ্রবর ধ্রুব ও প্রহ্লাদাদির অন্তর হইতে উদ্গত হইয়া এক দিন শ্রীভগবান্‌কে ব্যাকুল করিয়াছিল—স্থূলবিগ্রহে পৃথ্বীতলে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে প্রার্থনার, সে নামকীর্ত্তনের—সে কাতর ক্রন্দনের পথপ্রদর্শক এযুগে বাঙ্গলার ঠাকুর—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের মুক্তির উপায়। এই গ্রন্থের তাহাই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

জীবনের অপরাহ্নে আসিয়া পৌছিয়াছি। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর দৃষ্টির সম্মুখে পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছে। কেবল মনুষ্যত্বের মহিমা ও প্রেম-ধর্ম্মের অচিন্ত্য শক্তি—সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে এই দুইটীই সার সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। এই দুইটীই সনাতন তথ্য। আক্ষেপ হয়—এই তথ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার যোগ্য শক্তি বা বয়স আর নাই। অথবা আক্ষেপই বা কেন—সত্যের সেবক ও প্রচারকের কুত্রাপি কখনই অভাব হয় না, হিন্দুসমাজেই বা হইবে কেন? সেই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া চিন্তাশীল সমাজ-কল্যাণকামী আর্য্যসন্তানগণের নিকট এই অকিঞ্চিৎকর উপহার উপস্থিত করিলাম।

বারাণসী—
১লা মাঘ, ১৩০৭ সাল

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সূচী

সনাতন হিন্দু

হিন্দু মহাসভার

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন।

—ময়মনসিংহ—

সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা আমার ন্যায় একজন অকিঞ্চন ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে গৌরবাবহ সভাপতিপদে বরণ করিয়া যে সম্মান করিয়াছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, ইহাই হইল আমার সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের নিকট সবিনয় নিবেদন।

বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসভার সভাপতির কার্য্য বর্ত্তমান সময়ে যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তাহা জানিয়া এবং সেই সঙ্গে আমার নিজের ক্ষীণতর সামর্থ্যের কথা নিজে ভাল করিয়া অনুভব করিয়াও আমি যে এই গুরুতর ভার কেন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সে কৈফিয়ৎ আর কিছুই নহে, তাহা হইতেছে—আপনাদিগের সদিচ্ছা-সম্ভূত সমবেত আহ্বানের একটা মহীয়সী শক্তির প্রতি আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস। সুতরাং, আমি এক্ষেত্রে যদি আপনাদিগের

সন্তোষকর কিছু বলিতে সমর্থ হই, তাহাতে আমার নিজের কোন সামর্থ্যের দাবী একেবারেই নাই। তাহা আপনাদিগের সদিচ্ছার ও সমবেত আহ্বানের প্রভাব ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

বর্ত্তমান সময়ে এই বিশাল ভারতের বিরাট হিন্দুজাতি যে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছে, তাহা যুগযুগান্তব্যাপী ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘরে বাহিরে যে দিকেই চাহিয়া দেখি, আমাদের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য কত অপ্রতিবিধেয় শক্তিনিচয় মিলিত হইয়া আজ প্রবলবেগে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও আশঙ্কায় ও নৈরাশ্যে প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। নিজেদের মধ্যে যখন চাহিয়া দেখি তখন কি দেখিতে পাই ? তখন দেখিতে পাই—সর্ব্বনাশকর দারিদ্র্য, ভয়াবহ অজ্ঞান, অবসাদকর অনৈক্য, আর পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ও ঈর্ষ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

বাহিরে যখন চাহিয়া দেখি তখন দেখিতে পাই—পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে ঐহিক-সর্ব্বস্ব সভ্যতার গর্ব্ব। ঐশ্বর্য্যের অবিমৃষ্যকারিতা ও সঙ্ঘশক্তির দুর্দ্ধর্ষ আত্মম্ভরিতা যেন মিলিত হইয়াছে, উদ্দেশ্য—হিন্দুর যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মনোহর তাহাকে পদদলিত, নিষ্পেষিত ও অবজ্ঞাকলুষিত করিয়া এ সংসার হইতে অনন্তকালের জন্য অপসারিত করা।

আমরা কি ছিলাম তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, ভবিষ্যতে কি হইতে পারি তাহা ভাবিবার শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, ব্যক্তিগত তুচ্ছ-স্বার্থের প্রবল প্রেরণায় দিশেহারা হইয়া সমগ্রজাতির ধ্বংসের পথকে প্রশস্ততর করিতে অণুমাত্রও লজ্জাবোধ করি না, মুখে ধর্ম্মের দোহাই

দিতেছি, অন্তরে—হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে কাঞ্চনকৌলীন্য-প্রতিমার সিংহাসন স্থাপন করিতেছি। এইরূপ ঘরে ও বাহিরে ধ্বংসের জন্য উদ্যত প্রবল শক্তি নিচয়ের অবিসহ্য আক্রমণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সমগ্র হিন্দু-জাতি অদূর ভবিষ্যতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার নির্ণয় কে করিবে?

এই ভয়াবহ বিপদের দিনে পুণ্য ভারতভূমির সকল প্রদেশেই হিন্দু-মহাসভার সংস্থাপন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বজাতি হিতৈষণা ও স্বজাতি রক্ষার জন্য আন্তরিক উদ্যম ও উৎসাহ যে সর্ব্বথা প্রশংসনীয় তাহা কোনও অবস্থাভিজ্ঞ স্বজাতিপ্রেমিক হিন্দুসন্তান অস্বীকার করিতে পারেন না। এই কারণে আমি হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিন্দুর এ বিপদের দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। হিন্দুজাতি এ পৃথিবীতে মরিবার জন্য আসে নাই, কিন্তু নিজ আদর্শে সমগ্র পৃথিবীকে অনুপ্রাণিত করিয়া, সমগ্র ভূমণ্ডলে সুখশান্তি ও আধ্যাত্মিকতার স্থাপন করিবার জন্যই এই হিন্দুজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ইহাদিগের জীবন স্বার্থান্ধ আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবনিবহের অনভিপ্রেত হইলেও প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবে এবং নিজের কার্য্য অপ্রতিহতভাবে অদূর ভবিষ্যতে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া বিশ্ব-মানবের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সমাজে আত্মশক্তির পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। হিন্দুর এ আশা মরুমরীচিকা নহে, বা ইহা নিদাঘ-মধ্যাহ্নের স্বপ্নময়ী কল্পনাও নহে। কেন নহে তাহা বলি।

হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে কি বাহ্য কি আভ্যন্তর সকল প্রকার বিরোধিভাব নিচয়কে নিজের অনুকূল করিয়া আপনার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া

আত্মোন্নতি বিধান করাই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অন্য ধর্ম্ম বা অন্য সমাজ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য, অথবা ইহাই হইল হিন্দুর হিন্দুত্ব। হিন্দু যেমন পরকে আপনার করিতে পারিয়াছে, অন্য কোন জাতি তেমন করিয়া পরকে আপনার করিতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই, ইহাই হইল—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া হিন্দু ভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার পথে প্রাচীন হিন্দু কখনও বাধা দেয় নাই। শক, যবন, পারদ, পহ্লব, খশ, হূণ প্রভৃতি কত বৈদেশিক জাতি দিগ্‌বিজয় বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই ভারতভূমিতে প্রবেশ করিরা, হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুর প্রতিকূল ভাব বর্জ্জন করিয়া হিন্দুর যাহা যাহা সুন্দর, মধুর ও পবিত্রভাব, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে এবং আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিয়াছে—একথা ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বলিরা দিতেছে।

এই বৈদেশিক ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত জাতি সমূহের হিন্দুজাতি মধ্যে প্রবেশে প্রাচীনতর হিন্দুগণ বাধা প্রদান করিতেন না, প্রত্যুত উল্লাস ও উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে আপনার করিয়া হিন্দু সাজাইয়া হিন্দুজাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পথ যে সুপ্রশস্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত থাকিতেন, সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসের মধ্যে দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপে বেশনগর নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলা-লিপির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শিলালিপি পাঠে ইহা অবগত হাওয়া যায় যে, হেলিওডোরা (Heliodora) নামে কোন ব্যক্তি বাসুদেব মন্দিরের অগ্রভাগে একটী গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করিয়া-ছিলেন। এই হেলিওডোরা আপনাকে ভাগবত বলিয়া পরিচয়

দিয়াছেন। ইহার পিতায় নাম—ডিয়া (Diya)। এই ডিয়া জাতিতে যবন ছিলেন। তিনি যবননরপতির দূতরূপে এদেশে কোনও রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য গ্রীক্‌দেশের আম্‌লা লিকিটা (Amla Likita) নামক স্থান হইতে ভারতে ভাগভদ্র নামক নরপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ভাগভদ্র মালবের পূর্ব্বভাগে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই প্রস্তরলিপি যে খোদিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সকল প্রত্নতাত্ত্বিকই একমত। বিখ্যাত স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সার আর. জি, ভাণ্ডারকর স্বপ্রণীত "Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems" নামক গ্রন্থে এই শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ দেখিবেন।

আমাদিগের পুরাণেও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতির ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণে শুদ্ধির কথা দেখিতে পাই। ভাগবতেই আছে—

কিরাত-হূণান্ধ-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ
আভীর-শুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যেচ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ভাগবতে আরও দেখিতে পাই—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন বীক্ষণাৎ।

এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, চণ্ডালও যদি ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে সদ্যই তাহার যজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্ম্ম করিবার অধিকার লাভ হয়। এই ভাবের বহুতর প্রমাণ আমরা পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে দেখিতে পাই, আবশ্যক হইলে যথাবসরে সেই সকল

প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে। বিস্তার ভয়ে ও সময়ের অভাববশতঃ এখানে এই পর্য্যন্তই বলা সঙ্গত বিবেচনা করি।

হিন্দু একবার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে সে আর হিন্দু হইতে পারে না, অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার আর এজন্মে অধিকার হইতে পারে না, এইরূপ যে একটা ধারণা হিন্দু সমাজের আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গত কয়েক শতাব্দী হইতে বদ্ধমূল হইয়া হিন্দুসমাজের উন্নতি ও প্রসারের পথে প্রবল বাধা প্রদান করিতেছে, এই ধারণা যে হিন্দুর শাস্ত্রানুমোদিত সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। হিন্দুর প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক শাস্ত্রের মধ্যে এমন কোন পাপেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না—বিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা যাহা হইতে শুদ্ধিলাভ অসম্ভব বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।

ভারতে যবনসাম্রাজ্যস্থাপনের পর হইতেই স্মার্ত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইলেও, তন্ত্রমূলক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করিবার জন্য আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে না। বাংলার কাঙ্গালের ঠাকুর, পতিতের পাবন, প্রেমভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তপ্রধান যবন হরিদাসের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া বহনপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে সমাহিত করিয়াছেন। আশা করি—বর্ত্তমানযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে ইহা নূতন কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বর্ণবহির্ভূত ম্লেচ্ছ প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রকে হিন্দু মহাজাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যে আমাদের মধ্যে নূতন নহে, ভারতে যবন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে হিন্দু নিঃসঙ্কোচে

এইভাবে বিরাট হিন্দুজাতি গঠনে ব্যাপৃত ছিল, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ আমরা পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। পদ্মপুরাণে মাঘ-মাহাত্ম্যে কি উক্ত হইয়াছে শুনুন—

বৈষ্ণবো বর্ণ বাহ্যোঽপি
পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা নরাঃ॥

ইতিহাস-সমুচ্চয় বলিয়াছেন—

স্মৃতঃ সম্ভাবিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স জাতি নরকং ধ্রুবম্॥

গরুড়পুরাণ বলিতেছে—

মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্।
মৎকথা শ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেত্রাদিবিক্রিয়ঃ॥
বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্।
স্বয়মভ্যর্চ্চনংচৈব যো বিষ্ণুংচোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা হেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।

এই কারণে স্বয়ং ভগবান্‌ই বলিতেছেন—

নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃশ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥

শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত ষট্সন্দর্ভে ধৃত তত্ত্বসাগর গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে 'কুষন' নামে প্রসিদ্ধ বৈদেশিক পরাক্রান্ত জাতির একজন প্রতিভাশালী নরপতি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পুণ্য ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নাম ছিল ওয়েমা কাড ফিসেস্ (Wema Kad fises)। তাঁহার স্বরাজ্যে প্রবর্ত্তিত স্বর্ণমুদ্রার অপর পার্শে তিনি আপনাকে মাহেশ্বর বা শিবভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্বর্ণমুদ্রার পার্শ্বান্তরে শ্রীমহাদেব ও নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সময়ের অল্পতা বশতঃ আমাকে, এই জাতীয় প্রমাণের অতি প্রাচুর্য্য থাকিলেও, এই ক্ষেত্রে সে সমুদয়ের উল্লেখ হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইতে হইতেছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারা যায়, ভারতে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সমাগমের পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-তেজোবলসম্পন্ন, মহানুভব পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজরূপ শান্তিপতাকাশোভিত বিরাট প্রাসাদের দ্বার এখনকার ন্যায় শ্রদ্ধালু বৈদেশিক বা তথাকথিত পতিত জাতির জন্য চিরনিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। আধ্যাত্মিক ও ঐহিক অভ্যুদয়কামী নরনারী মাত্রেরই জন্য সেই সুবিস্তৃত কপাট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিতে তাঁহারা অনুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিতেন না বলিয়াই তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের সমাজও তাঁহাদের সভ্যতার জয় জয় ধ্বনি ভারতের বিস্তৃত সীমা লঙ্ঘন করিয়া, বিশাল জলধি বক্ষ অতিক্রম করিয়া সুদূর জাভা, সুমাত্রা মালয়, কাম্বোডিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশে দেবমন্দিরে, রাজপ্রাসাদে, ধনিবৃন্দের অট্টালিকায় ও জনপদবাসী দরিদ্র কৃষকের

কুটীরে সমুল্লাস ও সমুৎসাহের সহিত লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিত।

আমরা কি সেই হিন্দু? রামেশ্বরে, তাঞ্জোরে, ত্রিচিনাপল্লীতে, চিদম্বরে, মাদুরায়, কাঞ্চীতে, পুরীতে ভুবনেশ্বরে ও কোণার্ক প্রভৃতি স্থানে গগনস্পর্শী বিশালায়তন পর্ব্বতশিখরসম গোপুরাবলীমণ্ডিত বিশ্বমোহন মন্দির সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া যাঁহারা হিন্দু-স্থাপত্য ও হিন্দু-ভাস্কর্য্যের অতুলনীয় অক্ষয় কীর্ত্তিচ্ছটায় বিশ্বামানবের বিস্ময় সাধন করিয়া গিয়াছেন, সৃষ্টির অনন্ত বৈষম্যের মধ্যে সর্ব্বদা একরূপ, সকলের আত্মার আত্মা, অবিনাশী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিশ্বরূপিণী সত্তা উপনিষদের সরল মধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়া যাঁহারা জগতে সকল মানবের পক্ষে শাশ্বত শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, আমরা কি সেই হিন্দু জাতির বংশধর? নামতঃ আমরা তাঁহাদের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইলেও কার্য্যতঃ আমরা তাঁহাদিগের বংশধর বলিয়া পরিচিত হই না। সকল যোগ্যতাই হারাইতে বসিয়াছি। এ অযোগ্যতাকে, এই সঙ্কোচকে, এই ভীতিময় অবসাদের ভাবকে এবং এই সর্ব্বনাশকর নিজস্বরূপের অজ্ঞানকে আমাদিগকে দূর করিতেই হইবে, দূর করিতে না পারিলে আমাদিগের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনন্তকালের জন্য অচিরে কালসাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় মিশিয়া যাইবে।

আমাদের বাহিরের শত্রুর আক্রমণ অপেক্ষা অন্তঃশত্রুর আক্রমণই অতি ভয়াবহ। সেই অন্তঃশত্রুর মধ্যে প্রধান হইতেছে—আমাদিগের আত্মসত্তায়, আত্মমাহাত্ম্যে ও অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিতে একান্ত অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস দূর করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে—আমাদিগের মধ্যে আবার প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহারই উপর ঐকান্তিক নির্ভর করা।

আমরা মনে যাহা ভাবি মুখে তাহা বলিতে সাহস করি না, মুখে যাহা বলি অন্তরে তাহা বিশ্বাস করিনা,—ইহারই নাম হইল আত্মবঞ্চনা। আত্মবঞ্চিত জাতি কখনও এজগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমরা মুখে শাস্ত্রের দোহাই দেই, ভিতরে কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগের মধ্যে অতি অল্পেরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের আস্তিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে এই আত্ম-বঞ্চনার ভাব বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দু' একটা উদাহরণ অপ্রিয় হইলেও দেখাইতে হইতেছে।

আমরা মুখে বলি, অন্ত্যজ স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয়, অন্ত্যজের স্পৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা জল গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অনুন্নত জাতির হিতৈষী সংস্কারকদলের পতিতোদ্ধারণের জন্য চেষ্টা দেখিয়া আমরা 'ধর্ম্ম গেল' 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া চীৎকার করিয়া দেশবাসীর উৎকণ্ঠা উদ্বেগ বাড়াইতে অণুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিনা। কিন্তু রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে, মোটরবাসে, ট্রামে, খেয়ানৌকায় যাতায়াতের সময় কত অন্ত্যজের স্পর্শ করিয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অন্ত্যজ স্পর্শ করিয়া আপনাকে অপবিত্র ভাবিয়া, আমাদিগের মধ্যে কয়জন কয়বার শাস্ত্রবিহিত শৌচের আচরণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের ঘরে ঘরেই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সোডা, লেমনেড্, পাওরুটী, বিস্কুট অবাধে প্রবিষ্ট হইয়া আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য, বা ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারকারী আত্মীয় স্বজনকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্য আমাদিগের মধ্যে কয়জন বিহিত চেষ্টা করিয়া থাকেন? হিসাব করিয়া দেখিলে শতকরা নিরানব্বই জন যে সেরূপ চেষ্টা করেন না, বা করিবার জন্য অভিলাষীও নহেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ বা ইতিহাসের অধ্যয়ন না করিয়া কেবল ম্লেচ্ছ-ভাষার সাহায্যে যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, নিজ নিজ জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে সমাজের হিতসাধনের জন্য বর্ত্তমান কালোচিত চেষ্টা করিতে সাহসী হয়েন, তাঁহাদিগকে আমরা অবিশ্বাসী নাস্তিক বলিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করি না। কিন্তু আমার ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গলের নিদান স্বরূপ, বুদ্ধিমান্ বংশধরকে ইংরাজী পড়াইতে দ্বিধা বোধ করি না। চাকুরীকে শ্ববৃত্তি বলিয়া উপহাস করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাকরী নিজের বা নিজের পুত্রের জন্য জুটাইতে যাইয়া আমরা অম্লানবদনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে অধিকাংশ স্থলে লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করিনা।

জাহাজে চড়িয়া বিলাতে যাইয়া ম্লেচ্ছের অন্ন খাইলে হিন্দু মাত্রেই পতিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত পান ভোজনাদি ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারীও পতিত হইয়া থাকেন, এ সিদ্ধান্ত সভা করিয়া, সংবাদ পত্রের সাহায্যে ঘোষণা করিয়া আমরা বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, কিন্তু গোপনে এরূপ পতিত ব্যক্তিগণের দান গ্রহণ করিতে, বার্ষিক আদায় করিতে, মাসিকবৃত্তি আত্মসাৎ করিতে কখনও বিরত হই না। ধরা পড়িলে অজ্ঞানে অন্যায় করিয়াছি, বিহিত গুপ্তগঙ্গাস্নানাদিরূপ অন্যের অজ্ঞাতসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে তিলমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিনা। এই সকল মিথ্যা ব্যবহার আমাদের আস্তিক সম্প্রদায়ের অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিক্ষণে আমাদিগকে সত্যের পথ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আপনা-দিগকে বিব্রত করা উচিত নহে, সুতরাং এইখানে এই বিষয়ের পর্য্যবসান করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমাদিগের নিজেদের মধ্যে এই সকল অনাচার যদি আমরা নিরাকরণ করিতে সমর্থ না হই তাহা হইলে আমাদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া লোকে যে ধার্ম্মিক হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য আমার মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে তথা-কথিত নীচজাতির শুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চজাতির শুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক। শুধু আবশ্যক নহে অত্যাবশ্যক বলিয়াই আমার মনে হয়। তাই আমি বলি, হিন্দুসভার ভারতব্যাপী শুদ্ধি আন্দোলন অগ্রে নীচজাতির জন্য না হইয়া উচ্চ উচ্চতর জাতির জন্য যাহাতে হয় সর্ব্বাগ্রে তাহারই জন্য চেষ্টা করা উচিত।

আসল কথা এই হইতেছে যে বর্ত্তমান সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদিগকে ইহা মানিতে হইবে যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হিন্দু সমাজের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য, আমাদিগের ধর্ম্মের যাহা বাহ্য আকার অতীত অন্যূন সহস্র বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রানুসারে তাহার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বে আমরা যে করিয়াছি, তাহার প্রভূত প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। যুগধর্ম্মের প্রভাবেই এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মহর্ষিগণের বচনের বিরুদ্ধ পথও যে আমরা পূর্ব্বে অবলম্বন করিয়াছি এবং সেই বিরুদ্ধ পথকেও ধর্ম্মের পথ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তাহারও প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। আদিপুরাণ প্রভৃতিতে কলিবর্জ্য-ধর্ম্ম-প্রকরণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কার্য্যাণি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

এই বচনে বলা হইয়াছে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের মহর্ষিগণ

আমাদিগের জন্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল ধর্ম্মকার্য্যের বিধান করিয়া গিয়াছেন, কলিযুগের প্রারম্ভে দেশের মঙ্গলকামী ও সমাজের হিতৈষী মহাত্মগণ মিলিত হইয়া ঐ সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বন্ধ করিবার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে 'লোকগুপ্তি' অর্থাৎ হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে স্বজাতি রক্ষার জন্য, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হইলে মহর্ষিগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন একান্ত কর্ত্তব্য।

ঋষিগণ এখন আর আমাদিগের মধ্যে নাই, তাঁহারা যদি থাকিতেন তাহা হইলে এই ধর্ম্মবিপ্লবের মীমাংসা করিবার জন্য আমাদিগকে বিব্রত হইতে হইত না—ইহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহারা নাই বলিয়া, আমাদিগের বিবেক অনুসারে আমরা আমাদিগের কালোচিত ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার গ্রহণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিব না এবং করিলে আমরা অধার্ম্মিক হইব, হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করিব,—এরূপ অন্ধ বিশ্বাস অভ্যুদয়ে উদ্যুক্ত কোনও জীবিত জাতির পক্ষে কখনই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। তাই পুরাণকর্ত্তা ঋষিই আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন—

সময়শ্চাপি সাধুণাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ।

মনুষ্য সমাজ ঢালাই করা লোহার ফ্রেম নহে যে তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। মানুষ যেমন জীবিত, তাহার সমাজও সেইরূপ জীবিত, জীবনের স্থিতি, উন্নতি ও প্রসার যেমন পারপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে, মনুষ্য সমাজের পক্ষেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। কালের পরিবর্ত্তন বশতঃ সুতরাং সকল সমাজকেই অতীত আকার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ইহা না করিয়া কোনও মনুষ্যসমাজই এ সংসারে জীবিত থাকিতে পারে না। এই অবিসম্বাদিত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যদি হিন্দু ধর্ম্মের সেই বৈদিক যুগের বা স্মার্ত্ত যুগের আকারকে ধরিয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমরা যে কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিব না ইহা যিনি এখনও দেখিতে পান নাই, বা দেখিয়াও দেখিতে চাহেন না, তাঁহার নিকট হইতে নবজাগরণের আহ্বানে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ নব্যশিক্ষিত হিন্দু সমাজ কোনও উপকার পাইতে পারে, এ কথায় কেহই বিশ্বাস স্থাপন করে না, করিতে পারেও না।

কালপ্রভাবানুসারে ধর্ম্ম ও সমাজের রূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এই রূপ পরিবর্ত্তনের যুগে ধর্ম্মের বিধান অতিক্রম করিলে যে পাপ হয় না, সুতরাং কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরও আবশ্যকতা একেবারেই নাই, ইহা পরাশর সংহিতার ভাষ্য রচয়িতা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ননু উক্তরীত্যা কলিযুগে সর্ব্বেঽপি অভোজ্যান্নাভক্ষ্যভক্ষণাচ্চ, তথাসতি তদ্‌বিষয়কং প্রায়শ্চিত্তং নিরর্থকং, কৃতেঽপি প্রায়শ্চিত্তে পুনরপি তৎপ্রবৃত্তেরুপরন্তুমশক্যত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তবিধায়িকায়া পরিষদোঽসম্ভবাদ্ নহি পাপপ্রবৃত্তানাং পরিষত্ত্বং যুক্তম্। স্বধর্ম্মরত বিপ্রাণাং (পঃ স্মৃ ৮—২) ইতি তল্লক্ষণাৎ। নচ অভক্ষ্যভক্ষণাদিভ্যঃ পাপেভ্যোনিবৃত্তানাং শিষ্টানাং পরিষত্ত্বং স্যাৎ ইতি শঙ্কনীয়ম্ তাদৃশস্য কস্যাপি অদৃষ্টচরত্বাৎ। অতঃ কলিযুগে সর্ব্বেষাং নিন্দ্যত্বাদেতদেব যুগমুদ্দিশ্য প্রবৃত্তস্য পরাশরধর্ম্মশাস্ত্রস্য নির্ব্বিষয়ত্বং স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ :—

যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু তেষু চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে স্মৃতাঃ॥
(পঃ স্মৃঃ ১ম অধ্যায় ৩৩)

ইহার তাৎপর্য্য এই :—

পূর্ব্বে কথিত রীতি অনুসারে সকলেই অভোজ্যান্ন-এবং অভক্ষ্যভক্ষক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহাই যদি হইল তবে ত প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক হইয়া পড়িল, তাহার উপর প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরও আবার পাপ করিবার প্রবৃত্তি হইবেই, কারণ, এ যুগে তাহার উপরতি অসম্ভব। ফলে দাঁড়াইতেছে যে যাহারা মিলিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিবে সেরূপ যোগ্য লোক না থাকায় প্রায়শ্চিত্তাদির জন্য পরিষদ্ বা ব্যবস্থাপিকা সভাই থাকিতে পারিবে না। যাহারা নিজে পাপপ্রবৃত্ত, তাহাদের দ্বারা পরিষদের গঠন ত উচিত নহে, কারণ পরাশরই বলিয়াছেন স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণগণেরই দ্বারা পরিষদ্ গঠিত হইয়া থাকে ইত্যাদি। যাহারা অভক্ষ্যভক্ষণাদিরূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত, এমন শিষ্টব্যক্তিগণের পরিষৎ হইবে এরূপ মনে করাও ঠিক নহে, কারণ সেরূপ কোন ব্যক্তি এখনত আর দেখিতে পাওয়াই যায় না। এই কারণে কলিযুগে সকলেই নিন্দনীয় বলিয়া এযুগকে উদ্দেশ করিয়া প্রণীত হইয়াছে যে পরাশর ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা নির্ব্বিষয় হইয়া উঠিতেছে এরূপ শঙ্কা মনে রাখিয়া তাহার নিরাকরণার্থ পরাশর ঋষি বলিতেছেন—

যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মা স্তেষু তেষু চ যে দ্বিজাঃ।

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বর্ণন স্বয়ং মাধবাচার্য্যই যাহা করিয়াছেন তাহা শুনুন—

"অয়মাশয়ঃ দ্বিবিধা হি অধর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ যুগপ্রযুক্তা প্রমাদালস্যাদি প্রযুক্তা চ। তত্র যুগপ্রযুক্তায়াঃ প্রবৃত্তেরপরিহার্য্যত্বাৎ ন তন্নিবৃত্তয়ে পরাশরস্যোদ্যমঃ। যাতু প্রমাদালস্যাদিপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তত্র সাবকাশং ধর্ম্মশাস্ত্রং। তদ্ যথা অধ্যয়নবিধিস্তাবদর্থজ্ঞানপর্য্যন্তং সাঙ্গবেদ-পাঠমাচষ্টে। নচ কলৌযুগে তাদৃশং বিপ্রং কঞ্চিদুপলভামহে। তথা

ব্রহ্মচারিপ্রকরণে তদাশ্রমধর্ম্মা অধ্যয়নধর্ম্মাশ্চ সহস্রশঃ স্মর্য্যন্তে। ন চ তান্ সর্ব্বান্ যথাবদনুতিষ্ঠন্ মানবকঃ কোঽপি উপলভ্যতে। যদা অধ্যয়নস্যৈব ঈদৃশী গতিঃ তদা কৈব কথা সাঙ্গকৃৎস্নবেদার্থানুষ্ঠানস্য? তথা সতি শাস্ত্রীয়মুখ্যব্রাহ্মণ্যোপেতস্য কস্যাপ্যভাবাৎ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-জাত্যোশ্চ স্বরূপেনৈবোচ্ছিন্নত্বাৎ, শুশ্রূষয়িতব্যানাং দ্বিজানামসম্ভবে তচ্ছুশ্রূষকস্য মুখ্যস্য শূদ্রস্যাত্যন্তানাশঙ্কনীয়ত্বাৎ কিং চাতুর্ব্বর্ণ্যমুদ্দিশ্য প্রবৃত্তং ধর্ম্মশাস্ত্রং লুপ্যতাম্? কিংবা মুখ্যাসম্ভবে যথাসম্ভবং চাতুর্ব্বর্ণ্যং আশ্রিত্য ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততামিতি মীমাংসায়াং স্বরূপলোপাদ্বরং যথাসম্ভবানুষ্ঠানং ইত্যভিপ্রেত্য যুগপ্রবৃত্তাং সর্ব্বৈরপি অবর্জ্জনীয়াং অধর্ম্মপ্রবৃত্তিমদোষত্বেনাভ্যুপগম্য তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা ইত্যুক্তম্। পরিষত্ত্বং কুতো ন স্যাৎ? কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য পুনঃ প্রমাদালস্যাদি বর্জ্জনস্য সুকরত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রং চ সার্থকম্।"

"এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে লোকের অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, এক যুগপ্রযুক্ত, দ্বিতীয় প্রমাদ ও আলস্যাদি-নিবন্ধন, এই দুই প্রকার প্রবৃত্তির মধ্যে যুগপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি অপরিহার্য্য বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য পরাশরের উদ্যম নহে। প্রমাদ বা আলস্যাদি বশতঃ যে অধর্ম্ম প্রবৃত্তি হয় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা কিরূপ তাহাই দেখাইতেছি—অধ্যয়নের বিধি অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত সাঙ্গবেদের অধ্যয়ন বিধান করে। কিন্তু কলিযুগে এমন কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত সকল অঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্রের পাঠ করিয়াছেন। সেইরূপ ব্রহ্মচারী প্রকরণেও সেই ব্রহ্মচারী আশ্রমের ধর্ম্ম ও অধ্যয়নের ধর্ম্ম সহস্রপ্রকার স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানকারী একজন ব্রহ্মচারীও দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন অধ্যয়নেরই এই

অবস্থা, তখন সকল অঙ্গের সহিত সমগ্র বেদার্থের অনুষ্ঠানের কি কথা হইতে পারে?

তাহাই যদি হইল, তবে শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যযুক্ত কোন ব্যক্তিকেই বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির স্বরূপতঃই উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। সেবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব হওয়ায়, সেবাকারী মুখ্যশূদ্রেরও স্থিতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তাই বলিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কি লুপ্ত হইবে? অথবা মুখ্য চাতুর্ব্বণ্য না থাকিলেও যথাসম্ভব চাতুর্ব্বর্ণ্যকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযুক্ত হইবে?

এই বিষয়ের মীমাংসার প্রসঙ্গে—স্বরূপের একেবারে লোপ হওয়া অপেক্ষা যথাসম্ভব অনুষ্ঠানই ত উচিত—এইরূপ অভিপ্রায়ে সকলের পক্ষে অবর্জ্জনীয় যুগনিবন্ধন যে অধর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহা দোষাবহ নহে—এই প্রকার মানিয়া লইয়া, 'সেই সকল যুগের ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করা উচিত নহে'—ইহাই পরাশর বলিয়াছেন।

পরিষদই বা কেন না হইবে? যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রমাদ ও আলস্য বর্জ্জিত হওয়া সুকর; সেরূপ পুরুষগণকে লইয়া পরিষৎ গঠিত হইবে এবং প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রেরও সার্থক্য হইবে। আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। যুগানুসারে ধর্ম্মের বাহ্য আকার বদলাইতে হয়, আচারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়—ইহা হিন্দুর পক্ষে নূতন কথা নহে। যুগযুগান্তর হইতেই এরূপ পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজে কতবার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! সুতরাং আমাদিগকে আমাদিগের জাতির ও ধর্ম্মের স্থিতি, উন্নতি ও প্রসারের জন্য সময়োপযোগী আচার গ্রহণ ও পূর্ব্বকৃত আচারের পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহা স্থির।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আমরা কতদূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ে অগ্রসর হইতে পারি, তাহারও বিচার করা প্রয়োজন। সেই বিচার করিবার পূর্ব্বে একটা কথা সর্ব্বদাই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—হিন্দু মহাসভা সকল হিন্দুর মধ্যে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির জন্য গঠিত হইয়াছে, এই মহাসভার উদ্দেশ্য হইল হিন্দু মাত্রেরই উন্নতি। এ হিন্দু কে? মহাসভারই মতানুসারে ইহা সকলকেই বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যে সমুদয় ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে কোন একটিকে যাহারা অবলম্বন করিয়া আছে—তাহারা সকলেই হিন্দু। ইহাই যদি হিন্দু শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে হিন্দু বলিলে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বেদমার্গানুসারী আস্তিক-শিরোমণি ব্যক্তির ন্যায় বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা-সমাজী প্রভৃতি সকলেই এই হিন্দু সভার বর্ণিত হিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই এতগুলি জাতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করিবার গুরুতর ভার হিন্দুসভা যখন গ্রহণ করিয়াছে, তখন হিন্দুসভার অন্তর্গত প্রত্যেক সমাজের উন্নতির জন্য অপক্ষপাতে হিন্দু মহাসভার চেষ্টা করিতেই হইবে, ইহা স্থির। কিন্তু এক্ষণে ভাবিবার বিষয় ইহাই যে, যেখানে হিন্দু জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের স্বার্থ ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরস্পর বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ, সেখানে এই পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী দুইটী বা ততোধিক হিন্দু সম্প্রদায়কে লইয়া হিন্দু সমাজ কিরূপে চলিবে?

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সভার সর্ব্বপ্রধান দুইটী উদ্দেশ্য। একটীর নাম শুদ্ধি, অপরটীর নাম অস্পৃশ্যতা পরিহার। এ দুইটী বিষয় লইয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে বিষম মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সনাতনী হিন্দুগণ শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা পরিহারকে অধর্ম্মদৃষ্টিতে ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া

থাকেন। সভায়, পথে, ঘাটে, মাঠে, সংবাদপত্রে তাঁহারা এই শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতাপরিহারকে ধর্ম্মবিপ্লব বলিয়া মনে করেন। অপর দিকে পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত উদারভাবসম্পন্ন স্বজাতির মঙ্গলকামী নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দুমাত্রই মনে করেন যে, এই শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা পরিহার যদি এ সময় আমরা না করি, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, যে জাতির মধ্যে শত করা আশীজন ব্যক্তি অশিক্ষিত, পতিত, ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য, সে জাতি কখনই জগতের সমক্ষে সভ্যসমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। হিন্দুসমাজের প্রকৃত বলই হইল এই সকল তথাকথিত অধঃপতিত জাতি সমূহ। আমরা ইহাদিগকে স্পর্শ করি না, ইহাদিগের স্পৃষ্ট জল আমরা গ্রহণ করি না, ইহাদিগের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিয়া থাকি। আমাদিগের এইরূপ ব্যবহার আজ তাহাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে। নামে হিন্দু হইয়াও হিন্দু সমাজের ন্যায্য অধিকার হইতে সর্ব্বাংশে বঞ্চিত হইয়া আজ তাহারা ক্ষোভে, ক্রোধে, বিষাদে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া হয় খৃষ্টান না হয় মুসলমান হইতেছে, এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে চিরসঞ্চিত বিদ্বেষের বহ্নিকে আরও প্রবলভাবে জ্বালাইয়া হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় আমরা যদি তাহাদিগকে আমাদের সমাজে সমান অধিকার না দিই, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মবিনাশ অচিরে অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ যাহারা লোভে, ভয়ে বা অন্য কোন কারণে হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যদি আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহে, তাহা হইলে

তাহাদিগকে গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, ইহাই হইল নব্য-সম্প্রদায়ের মত।

প্রাচীনপন্থী সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন—যে একবার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যবন বা ম্লেচ্ছত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আর কিছুতেই হিন্দু হইতে পারে না—ইহাই হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রীতি। আমরা কিছুতেই এ রীতি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।

এইরূপ অত্যন্ত মতবিরোধস্থলে হিন্দু মহাসভার কি কর্ত্তব্য তাহারও একটু বিচার করা উচিত। আমি বলি, হিন্দু মহাসভার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ইহাই হইতেছে যে, আমাদিগের হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধের দ্বারকে রুদ্ধ করা। শুধু তাহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সমাজের হিন্দুমাত্রেরই মধ্যে যাহাতে একটা সহিষ্ণুতা ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আদর ও গৌরববুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। হিন্দু মহাসভা অস্পৃশ্য জাতির অস্পৃশ্যতা পরিহার করিবে, তাহাদিগের মধ্যে সদাচার প্রবর্ত্তন করিবে, শিক্ষার সমুন্নতি বিধান করিবে, তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ভাল করিয়া জাগাইবে, তাহাদিগকে বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ-সম্পন্ন করিবে। শতশতবর্ষব্যাপী উচ্চজাতির অবজ্ঞাজনিত তাহা-দিগের অবসাদ ক্ষোভ ও বিদ্বেষকে চিরদিনের জন্য অপসারিত করিয়া, সেই হৃদয়ে কলিযুগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম যে ভগবদ্‌ভক্তি, বিশ্বজনীন প্রেম ও ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠতা, তাহার স্থাপন করিবে। সেই সঙ্গে হিন্দুমহাসভা ব্রাহ্মণ্যপূত, সদাচারনিরত, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনের পথকেও প্রশস্ত করিবে।

এই দুইটী উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হিন্দুসভার গঠন, ইহা

যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে সহিষ্ণুতা বা universal toleration যাহাতে আমাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসে ও সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহা কিন্তু সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তাই বলিয়া ইহা যে অসম্ভব তাহাও নহে। যুগপ্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসমাজকে নব্যশিক্ষিত যুগানুরূপসংস্কারপ্রার্থী যুবকগণের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইলে চলিবে না, সভা সমিতিতে সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণের সহিত তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত হইতে হইবে। নিজের আস্তিকতা, নিজের পিতৃপুরুষাচরিত ধর্ম্ম, আচার ও নীতিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া হিন্দু মহাজাতির অভ্যুদয়ের জন্য অভিমান, মাৎসর্য্য ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একযোগে মিলিয়া কার্য্য করিতেই হইবে। অপরদিকে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে, প্রাচীন মতাবলম্বীর আস্তিক সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইবে, তাঁহাদিগের বিশ্বাসানুযায়ী কর্ত্তব্যের পথকে ঘৃণা বা উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে চলিবে না, শাস্ত্রব্যবসায়ী আস্তিকগণও যাহাতে অভীপ্সিত উন্নতিলাভ করিতে পারেন, ত্যাগ, সংযম ও তপস্যার সাহায্যে তাঁহারা আবার ভারতে আর্য্যসমাজের সমুজ্জ্বল ভাব ফুটাইতে পারেন, আবার আমাদিগের মধ্যে মহাপ্রাণ ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, দধীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের জাজ্বল্যমান আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহার জন্য নব্য সম্প্রদায় যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন।

আস্তিক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বর্জ্জন করিয়া, তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজের নেতৃত্বের পদ হইতে বিতাড়িত করিয়া, হিন্দুসমাজের বা হিন্দু মহাজাতির অভিপ্রেত সমুন্নতি যে আকাশ কুসুমের ন্যায় একান্ত অলীক, একথা নব্যসম্প্রদায়কে ভুলিলে চলিবেনা।

প্রত্যুত, তাহাতে হিন্দুজাতির পক্ষে কোন মঙ্গলই হইবেনা। বরং অধিকতর অনিষ্টই সজ্ঘটিত হইবে।

এই সকল গুরুতর সমস্যার সমাধান আমাদিগকে করিতেই হইবে। এ সমস্যার সমাধান না হইলে, হিন্দু জাতির অভ্যুদয়ের জন্য হিন্দু মহাসভার চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারেনা, ইহাই হইল আমার ধারণা।

আর একটী কথা এই যে, অস্পৃশ্যজাতির প্রকৃত যাহা অভ্যুদয়, তাহারই জন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে হইবে, তাঁহাদের দারিদ্র্য, তাহাদের অজ্ঞান, তাহাদের মলিন আচার যাহাতে দূর হয়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। সাময়িক একটা উত্তেজনার বশে একটা বিরাট সভায় সমবেত হইয়া তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল খাইলে বা তাহাদিগের পরিবেষিত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেই তাহাদের যে উদ্ধার হইবে, এবিশ্বাস আমার নাই। আমরা যদি তাহাদিগকে সদাচারসম্পন্ন করিতে পারি, তাহাদিগের মধ্যে উদার শিক্ষার সার্ব্বজনীন প্রচার করিতে পারি, তাহাদিগের ধনাগমের পন্থাকে প্রশস্ত করিতে পারি, সর্ব্বশেষে তাহাদিগকে যদি ভগবদ্‌ভক্ত করিতে পারি, তবেই তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই উন্নত হইবে এবং আমাদিগের সমাজে তাহাদিগের স্থান যে আরও উচ্চতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল বিষয় সুসিদ্ধ করিতে হইলে আমাদিগের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের একতা সাধন করিতেই হইবে। হিন্দু আদর্শ কি তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, জনপদে জনপদে শিক্ষিত উদার ধর্ম্মপ্রকৃতিসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ প্রচারকের দল প্রেরণ করিতে হইবে। তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে

নগরে নগরে ভাগবত প্রভৃতি পুরাণব্যাখ্যার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলিযুগের সারধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনের প্রবল বন্যায় ভারতের সকল প্রদেশ ভাসাইতে হইবে। আমাদিগের বালকগণের মধ্যে অতি শৈশব হইতে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, গৌরব ও ভালবাসার ভাব, যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কর্ম্মদোষেও অনাচারে মানবের দেহ অশুদ্ধ হয়। কিন্তু মানবাত্মার বিশুদ্ধতা নিত্যসিদ্ধ। দেহের অশুদ্ধি দূর করিবার জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ অবলম্বিত হওয়া উচিত। আত্মার অশুদ্ধি অজ্ঞানকল্পিত মাত্র। আত্যন্তিক-বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন রাগ ও দ্বেষের প্রাবল্যই সেই কল্পিত অশুদ্ধিকে আরও দৃঢ় করে। সুতরাং সেই কল্পিত অশুদ্ধির নিদানভূত অজ্ঞানকে দূর করিতে পারিলেই, আত্মার নিত্যসিদ্ধ বিশুদ্ধতার বিকাশ হইয়া থাকে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এই সকল সিদ্ধান্ত যাহাতে হিন্দু-মাত্রেরই কর্ণগোচর হয়, তাহার জন্য বিহিত উপায়ের বিধান সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে করিতে হইবে। আমাদের মনে থাকে যেন হিন্দুর স্বরাজ হিন্দুত্বের পূর্ণ বিকাশের উপরই নির্ভর করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে সেই হিন্দুত্বের পূর্ণ বিকাশ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে হইবে। ধর্ম্মের আন্দোলনকে প্রধান করিয়া, তাহার সাহায্যে আমাদিগের মোহ অন্ধকার দূর করিয়া আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেই প্রতিষ্ঠাই আমাদিগের প্রকৃত স্বরাজ লাভের প্রকৃষ্ট সাধন। ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি।

আজ আর অধিক কথা বলিয়া আপনাদের উদ্বেগের সৃষ্টি করিতে চাহিনা, একটী মাত্র কথা শুনাইয়া আপনাদিগের নিকট আজিকার জন্য বিদায় গ্রহণ করিব। সে কথাটী এই—

যদিচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
পরাপবাদশস্যেভ্যো গাং চরন্তীং নিবারয় ॥

মহাভারতের এই পুণ্য উপদেশ যেন আমাদিগের গন্তব্য পথের ধ্রুবতারা স্বরূপ হয়। আর সেই সঙ্গে আমরা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখি—

All are but parts of one
Stupendous Whole.
Whose body Nature is, and
God the soul. (Pope)
So many Gods, so many creeds
So many paths that wind and wind.
While just the art of being kind
Is all the sad world needs. (E. W. Wilcox)

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের সারমন্থন করিয়া, হিন্দু মাত্রের উপাস্য শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে "যত্র সর্ব্ববিরুদ্ধধর্ম্মানাং সমন্বয়ঃ স এব শ্রীভগবান্"। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমিও সকল সঙ্কোচ পরিহার করিয়া ইহাই বলিতে চাহি যে, যে ধর্ম্মের দ্বারা জগতের আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান সকলধর্ম্মের সকলপ্রকার বিরোধের সমন্বয় সাধিত হয় এবং যাহার দ্বারা সকল মানবজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান ও অভিমানমূলক অশান্তি দূরীকৃত হইয়া বিরাট বিশ্বমানবসমাজে প্রেমমৈত্রীময় শাশ্বত শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারই নাম হিন্দুধর্ম্ম। তাহাই ভারতের অনাদিকালসিদ্ধ সনাতন বৈদিকধর্ম্ম। এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বৈরিতা, বিদ্বেষ ও কলহের স্থান নাই, আচার্য্য শঙ্কর শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি পরস্পর বিবদমান সম্প্রদায় সমূহকে এক অখণ্ড স্বয়ং প্রকাশ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের

অবিনাশী মহিমার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া ম্রিয়মাণ হিন্দুজাতির নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, কালবশে অজ্ঞান-মালিন্য-কলঙ্কিত সেই হিন্দু জাতির মধ্যে আবার অসীম শক্তিশালী নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্যই, নিপীড়িত পদদলিত ভারতব্যাপী হিন্দুসমাজের সমবেত আত্মোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা এই হিন্দু মহাসম্মেলন রূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। কে আছ হিন্দুসমাজের আত্মত্যাগী জ্ঞান-বিজ্ঞান-সত্য-সেবক সেবক? তোমার কার্য্যের জন্য শুভলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের, কাঙালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের, মহাপ্রাণ কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির পরিত্যক্ত জাতীয় পতাকা সাহসের সহিত, সত্যনিষ্ঠার সহিত, নিজ অন্তর্লীন মহাশক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উঠাইয়া লও। হিন্দুর জাতীয় নেতার শূন্য সিংহাসনে আসিয়া নির্ভয়ে উপবেশন কর। আর দেখাও, জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা-কর, মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দও—হিন্দুর জাতীয় জীবনের এই নব-জাগরিত উৎসাহ ও আশারূপ পূতমন্দাকিনীর পুণ্যধারা কোন্ পথে বহিবে।

তোমার প্রসারিত জাতীয় পতাকার শীতল শান্তছায়ায় দাঁড়াইয়া হিন্দু স্বজাতির মধ্যে উচ্চনীচভাব চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হউক। সকল ভাই, সকল ভগিনী একত্র মিলিত হইয়া দ্বেষ, হিংসা, অবিশ্বাস, সংশয় ও অনৈক্য পরিহার করিয়া আবার মানুষ হউক। মানুষ হইয়া জগতের শাশ্বত শান্তি ও বিশ্বতোমুখ আনন্দের মনোহারিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া ভারতে জন্মলাভের মহান্ উদ্দেশ্যকে সফল করিতে সমর্থ হউক।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥ •

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হিন্দু-সমাজ-সম্মেলন

—কলিকাতা—

সভাপতির অভিভাষণ

বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয়-নবজীবন-লাভের ইতিহাসে আজিকার এই সর্ব্বজাতিসম্মেলন এক অনন্যসাধারণ ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ইহার সাফল্যের উপর বাঙ্গলার সমগ্র হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ সুমহান্ অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে, ইহা আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস। কেন যে আমার এই বিশ্বাস, তাহা বলি। হিন্দু জাতির অতীত সহস্রাধিক বৎসর হইতে যে অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কারণ অনেক হইলেও, আমাদিগের উচ্চ-নীচ-ভাব-ব্যঞ্জক বিভিন্ন-জাতি-গত বৈষম্য ও তন্মূলক একের অপরের প্রতি নীচতা, হেয়তা ও অস্পৃশ্যতাদি দুস্ত্যজ কুসংস্কারই ঐসকল কারণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ও অতি ভয়াবহ। ইহা আমরা এতকাল পরে যে বুঝিতে পারিতেছি, ইহাই আমাদের নৈরাশ্যময়, অবসাদপূর্ণ, পরস্পরবিশ্বাসহীন সুতরাং পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনের পক্ষে দুরপনেয় দীর্ঘ তমোনিশার পর প্রথমদৃষ্ট উষালোকের ন্যায় আশাপ্রদ। ইহা যে ব্যক্তি বুঝে না, বা বুঝিয়াও আজন্মসিদ্ধ জাতি-

নাশকর প্রাধান্য, সুবিধা ও বৃত্তি-লোপের ভয়ে প্রকাশ্যে মানিতে চাহে না; শুধু কি তাহাই—ধর্ম্মলোপের ভয় দেখাইয়া, অপরিশীলিত সুতরাং অনববুদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের দোহাই দিয়া, এই নবজীবনসঞ্চারক ঊষালোককে যে ব্যক্তি গোঁড়ামীর দুর্ভেদ্য উচ্চপ্রাচীর উঠাইয়া আবৃত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া থাকে এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সংবাদপত্রে ও সভাসমিতির সাহায্যে অন্তর্নিহিত বিষজ্বালাপূর্ণ কটূক্তিনিবহের বর্ষণ করিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই ব্যক্তি হইতেছে আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রধান অন্তরায়।

আমাদের বাহিরের শত্রু তত ভয়াবহ নহে। সমাজের ভিতরেই যে আমাদের প্রবল শত্রু রহিয়াছে, তাহার করাল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সম্মিলিত হিন্দু-সমাজকে সর্ব্বাগ্রে প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। এ শত্রু কে? এ শত্রু আমাদিগের অজ্ঞান-মুলক, অত্যুদার-সনাতন-হিন্দুশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা-প্রসূত, সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কার ছাড়া আর কেহই নহে। এই কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কারকে আমরা দূর করিব। অগাধ শাস্ত্রসমুদ্রকে বিবেকরূপ মন্থানদণ্ডের সাহায্যে মথিত করিয়া তাহা হইতে উদ্ধৃত যে সত্যামৃত তাহাই আমরা পান করিব—পান করিয়া সজীব হইব, অমর হইব। সেই অমৃতপানে অসীমশক্তিসম্পন্ন হইয়া আমরা আবার সভ্যসমাজে বরণীয় আসন লাভ করিব। ইহাই হইল আমাদিগের এই সর্ব্ব-জাতি-সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদিগের সমাজের মধ্যে জাতিগত ও বর্ণগত, সভ্যসমাজবিগর্হিত উচ্চনীচভাব ও তন্নিবন্ধন আমাদিগের পরস্পর মিলিত হইয়া জাতির হিতকর কার্য্য করিবার

অসামর্থ্যই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল ও মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছে, ভীরুতা আমাদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছে। এই দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরিহার করিতে না পারি, তাহা হইলে জাতিহিসাবে আমাদিগের মরণ যে অচিরভাবী ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

এই অবশ্যম্ভাবী ও অচিরভাবী মরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত মিলিত ভাবে কোন নির্দ্দেশযোগ্য কার্য্যই আমরা করিতে পারি নাই। সেই কার্য্য করিবার জন্যই বাঙ্গলার শতধা বিভক্ত হিন্দুজাতির আজ এই মহাসম্মেলন। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাসে এরূপ শুভমিলন সম্পূর্ণভাবে নূতন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধুমাসে এই মধুময় মহামিলনের বিরাট সভার নেতৃত্ব করিবার গুরু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান ও গৌরব দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব ও অধিক সম্মান বাঙ্গালী কোন বাঙ্গালীকে দিতে পারে না। আমার ন্যায় অকিঞ্চনের প্রতি আপনাদের প্রীতিময় ব্যবহার, আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। ইহার জন্য আপনারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

হিন্দুসমাজ-সংস্কার ব্যতিরেকে হিন্দুজাতি বর্ত্তমান যুগে স্বরাজ লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। ইহা জানিয়াও, আমরা যে ভাবে যেরূপ দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজ-সংস্কার করা আবশ্যক, তাহা করিতে পারিতেছি না কেন, অগ্রে সেই বিষয়েই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নবযুগে বঙ্গমনীষার বরণীয় আদর্শ রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদের দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কিন্তু যেদিন হইতে এই আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই প্রাচীন-আচার-পন্থিগণও এই আন্দোলনের অনর্থকারিতা ও সনাতনধর্ম্ম-দ্রোহিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ উদ্যোগ করিয়া আসিতেছেন, ইহা আমাদের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ, বিলাতযাত্রা, অস্পৃশ্যতা পরিহার শুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য সমাজ-সংস্কারনিবহের মধ্যে একমাত্র সতীদাহনিবারণ ব্যতিরেকে আর সকল সংস্কারই যেরূপ ভাবে যতশীঘ্র হওয়া উচিত, সেইভাবে তত শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। তাহা না হইবার প্রধান কারণ হইতেছে দুইটি—প্রথম, দেশের নেতৃপদে আরূঢ় হইয়া যাঁহারা রাজনৈতিক অধিকারলাভের আন্দোলনে সর্ব্বথা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজ সংস্কার কার্য্যকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মুখেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজসংস্কার ব্যতিরেকে স্বরাজলাভ যে অসম্ভব, এই ধ্রুব সত্যের প্রতি তাঁহাদের যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ইহার কোন প্রমাণই তাহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া জন সাধারণ এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন, খদ্দরপ্রচলন, রাজকীয় কার্য্যে অসহযোগ, খাজনা দেওয়া বন্ধ করা প্রভৃতিই তাঁহাদের নিকট স্বরাজলাভের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামাজিক দুর্নীতিনিবহের ধ্বংস দ্বারা যে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে পরস্পর সহানুভূতি-মূলক সঙ্ঘশক্তি সমুজ্জীবিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই যে তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়সমূহ ফলপ্রদ হইবে না, ইহা তাঁহারা এখনও বুঝিতেছেন না, বা বুঝিয়াও কায়মনোবাক্যে সমাজের সর্ব্বনাশকর অনাচার ও অত্যাচারনিবহকে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে আর কি হইতে পারে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই যে বর্ত্তমান সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া

কার্য্য করিবার জন্য অনেক পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? সভাসমিতি করিয়া, আবশ্যক চাঁদা আদায় করিয়া দেশের অজ্ঞ লোকের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি জাগাইবার ক্ষমতা এখন তাঁহাদিগের মধ্যেই আছে ! তাঁহারা কিন্তু সেই ক্ষমতার নীতিসঙ্গত ব্যবহার না করিয়া বহুল ভাবে আত্মশক্তির অপচয়ই করিতেছেন। তাঁহাদিগের আন্তরিক সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জনহিতকর আন্দোলনই যে বর্ত্তমান সময়ে সার্থকতা লাভ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে।

বঙ্গীয় হিন্দুজাতিসম্মেলনের এই স্মরণীয় মহাধিবেশনের আরম্ভ সময়ে আমাদিগের দেশের বরণীয় রাজনৈতিক নেতৃগণকে এই অপ্রিয় সত্য কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে বাধ্য হইয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এখনও সময় আছে। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হিন্দুসমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কারের জন্য দৃঢ়তাসহকারে অগ্রসর হউন। এবং বঙ্গের এই সম্মেলনকে সার্থক্যমণ্ডিত করুন। সামাজিক আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য আর একটী গুরুতর বাধাকেও অপনীত করিতে হইবে। সে বাধা কি, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি—জাতীয় উদার শিক্ষার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন আমাদিগের দেশে এখনও হইতেছে না। এই কারণে দেশের অধিকাংশ লোকই বর্ত্তমান যুগের সভ্যমানবজাতিগণ কিভাবে স্ব স্ব সমাজের অভ্যুদয় সাধন ও প্রাচীন অনিষ্টকর আচার সমূহের বর্জ্জন করিতেছে, তাহার জ্ঞান আমাদিগের সামাজিক স্ত্রীপুরুষগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল সামাজিক নরনারীগণ সহস্র সহস্র বৎসরের জীর্ণ প্রাণহীন আচার সমূহকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। সামাজিক বিষয়ে এই শতকরা নব্বই জন লোকের নেতৃত্ব করিবার ভার

লোকতঃ, শাস্ত্রতঃ, ও ধর্ম্মতঃ যাঁহাদের উপর বহুকাল হইতেই ন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদিগের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, অসত্যপরায়ণতা, কপটতা ও সঙ্কীর্ণস্বভাবতা বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসমাজের যে কি পরিমাণে উন্নতি-প্রতিবন্ধক অনিষ্টসাধন করিতেছে ও কিরূপে ধ্বংসের অন্ধতমসাবৃত পথে দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলার হিন্দুজাতির সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে—ইহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাই তাহারই একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এখন একশত বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে মাত্র ছয়জন ব্রাহ্মণ। ইহাদিগের সংখ্যা মোটের উপর এগার লক্ষ হইবে। শতকরা পাঁচজন মাত্র কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়। দুইশতের মধ্যে একজন মাত্র ক্ষত্রিয়। বৈদ্যজাতির সংখ্যা শতকরা কায়স্থগণ হইতে অল্প।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির সংখ্যা মোটের উপর শতকরা ১২.৮। ইহাদের পর নবশাখ ও অন্যান্য সংশূদ্র আছে। বারুজীবী, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সদ্গোপ, তাম্বুলী, তন্তুবায়, তেলী প্রভৃতি জাতি এই সংশূদ্রের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় একত্রিশ লক্ষ, বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১৬.৪। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ইহাদিগের মধ্যে সদ্গোপের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মালাকারের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। অর্থাৎ সদ্গোপের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হইবে। মালাকারের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার মাত্র। ইহাদিগের ছাড়া আর একটি বৃহৎ শ্রেণীর সংখ্যা শতকরা ১৩.৪ হইবে। তন্মধ্যে চাষী কৈবর্ত্তের সংখ্যা প্রায় কুড়িলক্ষ। ইহাদিগের অধিকাংশের বাস পশ্চিম বঙ্গে। গোয়ালাদিগের সংখ্যা প্রায়

ছয়লক্ষ হইবে। ইহা ছাড়া আরও একটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণবণিক, শুঁড়ী, সাহা সূত্রধর প্রভৃতি। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় তের লক্ষ হইবে। সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় ইহারা শতকরা ৮·৮ জন।

এই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক অবস্থারও বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সুবর্ণ বণিক ও সমৃদ্ধ সাহাগণ ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই প্রায় উচ্চশ্রেণীর আদর ও সম্মান পাইয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব ও যোগী-সমাজ যেন হিন্দুসমাজ হইতে বিশেষ ব্যবহিত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ—ইঁহাদিগের গৃহে ব্রাহ্মণগণ পৌরহিত্যাদি করেন না, কিন্তু অন্যজাতির অর্থাৎ সাহাও সুবর্ণবণিকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ পৌরো-হিত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ কিন্তু বর্ণ-ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত। ইঁহাদিগের সহিত সমুন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সামাজিক সম্বন্ধ একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। এই শ্রেণীর স্পৃষ্ট জলও সমাজে অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিগণিত। ইহাদিগের ছাড়া আর এক শ্রেণীর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, যথা বাগ্দী, চাষাতি, জেলে, ধোপা, কৈবর্ত্ত, কালু, মালো, কাপালিক, নমঃশূদ্র, পাটনী, পোদ, পলিয়া, রাজবংশী, শুক্লী, তেওর ও টেব্রা প্রভৃতি জাতি, ইহাদিগের মোট সংখ্যা কিন্তু ৭৬ লক্ষ হইবে। বঙ্গের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ইহারা শতকরা ২৯·৭ জন। ইঁহাদিগের মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যা বিশ লক্ষেরও অধিক। নমঃশূদ্রের সংখ্যা প্রায় আঠার লক্ষ। বাগ্দীর সংখ্যা এগার লক্ষ। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চজাতি—নবশাখ, সূত্রধর এবং গোয়ালাগণ ও ইঁহাদিগকে নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্যাদি করেন। কিন্তু ঐ সকল ব্রাহ্মণকে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ একপ্রকার পতিত বলিয়া

বিবেচনা করেন। এই সকল জাতিরও জল অস্পৃশ্য। ইহাদিগের নিম্নে আর একটী স্তর আছে যেমন ডোম, চামার, বাউরী, হাড়ি, ভুইমালী, কেওরা, কোরা, মাল, মুচি প্রভৃতি। ইহাদিগের সংখ্যা সতেরো লক্ষ হইবে। বঙ্গের সমস্ত হিন্দুর সংখ্যার অনুপাতে ইহাদের সংখ্যা শতকরা ৮'৯ হইবে। মুচির সংখ্যা চারিলক্ষেরও অধিক, হাড়ির সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ডোম প্রায় দুই লক্ষ। চামারের সংখ্যা একলক্ষ পঁচিশ হাজার। ইহারা যে জল স্পর্শ করে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে তাহা অব্যবহার্য্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যে গৃহে বাস করেন ইহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়না। ইহাদিগের মধ্যেও কাহারো কাহারো ব্রাহ্মণ আছেন, কিন্তু এ সকল ব্রাহ্মণও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকেন।

নবশাখ ও কৈবর্ত্ত জাতির ধর্ম্মকার্য্য যে সকল ব্রাহ্মণ সম্পাদন করেন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকেও হীন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই নবশাখও কৈবর্ত্ত জাতির সংখ্যা বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ হইবে। বাকী হিন্দুর যাজন করিতে অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই সম্মত হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই কার্য্য করেন, তাঁহারা 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' বা 'ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত। শত করা যে তেরজন উচ্চজাতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহারা শতকরা তিরিশটী ভিন্নজাতীয়ের সহিত সামাজিক কার্য্যে এমনকি একত্র উপবেশনকেও অপকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বাকী জাতির সহিত সংস্পর্শ ইহাদের নিকট অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া প্রতীত হয়। ঐসকল তথাকথিত নিকৃষ্ট জাতির লোক যে জলস্পর্শ করে, অন্যান্য জাতি তাহা গ্রহণ করাকে ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া মনে করে।

ইহাই হইল বঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থা। ইহা অপেক্ষা

শোচনীয় সামাজিক দুরবস্থা অন্য কোন সভ্য-মানব-সমাজে নাই, হইতেও পারেনা। ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, সমগ্র বঙ্গদেশে এককোটি ৯১ লক্ষ হিন্দু বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক শতে ১৩ জন মাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি, ষোল জন নবশাখ ও সচ্ছূদ্র, তেরজন করিয়া তদধম জাতি, ১০ জন করিয়া এমন জাতি আছে যাহাদিগের জল পর্য্যন্ত আচরণীয় নহে। বাকী আটচল্লিশ জন এমন নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে তাহাদের জল পর্য্যন্ত স্পৃশ্য নহে। তাহারা এমনই নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে তাহাদের ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল কার্য্যে তাহারা ব্রাহ্মণের—ভূদেবের—মুখ পর্য্যন্তও দেখিবার অধিকার হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে বঞ্চিত।

আমাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত, তাহারা কিন্তু হিন্দুর গৌরবাবহ সকল প্রকার অধিকার হইতে দূরে বিতাড়িত। তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আমাদের মধ্যে উচ্চ জাতিগণ প্রস্তুত নহেন। তাহাদের দারিদ্র্যপীড়িত মলিন পল্লীর মধ্যে আমাদের সমাজের নেতা ভূদেবগণ কখনও প্রবেশ করেন না; তাহারা কি খায়, কি পরে, রোগে, শোকে, অন্নাভাবে, কুসংস্কারে কিরূপ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত ভাবে দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করে, তাহার খবর লইলে, তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইবার জন্য আবশ্যক মেশামিশি করিলে, আমাদের সমাজের জাত্যভিমানে স্ফীত নেতৃবর্গের ধর্ম্ম রসাতলে যায়, জাতি হইতে বহিস্কৃত হইতে হয়, ধর্ম্ম-দ্রোহী, সমাজ-দ্রোহী, স্বার্থপর ও কপটাচারী প্রভৃতি অশ্রাব্য কটূক্তি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রুতিবিবর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সনাতন ধর্ম্ম কি—ইহাদিগকে তাহা আমরা জানাইবার জন্য কোন চেষ্টা করি না; জানাইবার সাহস যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের ধর্ম্মরক্ষকগণ

হিন্দুসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতে গৌরববোধ করেন, এবং গোঁড়াদলের মুখপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের ও ব্রহ্মণ্য তেজের অসাধারণত্বের বিকট চীৎকারে বঙ্গের আকাশ-পবন মুখরিত করিয়া থাকেন। হিন্দুর দেবমন্দির, হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র অত্যাচারী অশিক্ষিত দস্যুতুল্য কামুক বিধর্ম্মীগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, এই শতকরা আটচল্লিশ জন অস্পৃশ্য, তথাকথিত নীচ জাতিগণই, কিন্তু, সর্ব্বাগ্রে লাঠি হাতে করিয়া বিপক্ষের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয় এবং আমাদের সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে তিলমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। উচ্চজাতির পায়ের জুতা সেলাই করিয়া, পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া, গমনাগমনের পথে প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া, উদরান্নের সংস্থানের জন্য শীতবর্ষা ও আতপে জীবনান্ত করিয়া, ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইয়া ইহারা সেবা করিতেছে, শুধু এখনই করিতেছে তাহা নহে, শতশত বৎসর করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের ঐহিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা এমন কিছুই করি নাই, যাহার জন্য ইহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে পারে বা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে। অথচ ইহারা আমাদিগকে প্রভূত সম্মান এখনও করিয়া থাকে এবং খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতে আমাদিগকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে গৌরব বোধও করিয়া থাকে। আমরা, কিন্তু, ইহাদিগের জন্য, ইহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য, সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পবিত্র ভাব ইহাদিগের হৃদয়ে জাগাইবার জন্য কিছুই করিতেছিনা। এবং আমরা তাহা করিতেছি না বলিয়াই ইহাদিগকে আপনার করিবার জন্য বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ও প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেছে, এবং ইহার ফলে গত পঞ্চাশ বৎসরের

মধ্যে এই ব্রহ্মভূমিতে মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানের দল কি পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে, তাহার খবর আমাদিগের মধ্যে অতি অল্পলোকেই লইতে উদ্যত আছেন।

আমাদিগেরই এই আত্মজাতিধ্বংসকর ব্যবহারের ফলে এইসকল তথাকথিত নিম্নস্তরের জাতিগণ তাহাদিগের পক্ষে অনন্ত দুঃখের ও অবমাননার হেতু হিন্দুয়ানীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিধর্ম্মীর দলই ক্রমে পুষ্ট করিতেছে। যাহারা গোসেবাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহারাই গোখাদক রূপে আত্মপরিচয় প্রদানে আজ শ্লাঘাবোধ করিতেছে, যাহারা হিন্দুর দেবমন্দিরের রক্ষাকার্য্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহারাই আজ দেবমন্দির ধ্বংস ও দেবতার বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করাকে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলের কারণ বলিয়া বোধ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে, তাহা কল্পনায়ও আসে না। আমাদিগের দেশে অপ্রচলিত, এবং বর্ত্তমান সময়ের একান্ত প্রতিকূল, প্রাচীন আচার নিয়মের রক্ষার জন্য যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন, সেই দলের নেতৃস্থলাভিষিক্ত, বাঙ্গালার বিদ্যামন্দির চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, বড় বড় নামধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। সময়ের অনুকূল ভাবে স্বজাতি-ও স্বধর্ম্ম-রক্ষার পূর্ণ অভিলাষে পরিচালিত ব্যক্তিগণ এই সকল দুরবস্থার কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা ঘৃণা ও উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, হিন্দুসমাজের মধ্য হইতে এই সকল নীচ জাতি দলে দলে বাহির হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? যদি একজন ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে আবার ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইবে, মন্ত্রশক্তির

বলে সত্যযুগ আসিবে। সুতরাং সদাচারপূত, শাস্ত্রবিশ্বাসসম্পন্ন, নীচ-পতিত-সংসর্গে অকলুষিত ব্রাহ্মণ জাতির রক্ষা কিসে হয়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আমরা করিব, হিন্দুর সংখ্যা কম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই; হিন্দুর নাম বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হউক তাহাতেও আপত্তি নাই। জনকয়েক সদাচারপূত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যদি আমরা বাঁচাইয়া রাখিতে পারি আর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নিবন্ধগ্রন্থগুলি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া, সভায় উচ্চ বিদায় লাভ করিবার জন্য, মনের মতন করিয়া কতকগুলি নিরীহ ছাত্রকে পড়াইতে পারি, তাহা হইলে আমরা বাজিমাৎ করিতে পারিব; বঙ্গে আবার জোর করিয়া বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব।

এই প্রকার যাঁহাদিগের মনোবৃত্তি, তাঁহারাই যে হিন্দুর বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু—একথা আজ বঙ্গের শিক্ষিত হিন্দুগণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই আমাদিগের পক্ষে বড় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বাঙ্গালী হিন্দু আত্মজাতির রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য, নিজ সমাজের বিধ্বংসকর দুর্নীতি ও দুরাচার-নিচয়ের পরিহার পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে নবজীবন প্রতিষ্ঠা করিতে সত্য সত্যই সমুদ্যত হইয়াছে, আমাদিগের অদ্যকার এই বঙ্গীয় হিন্দুজাতিনিবহের বিরাট সম্মেলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—ইহা যে বুঝে না তাহার মানসিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ বা অপকর্ষ ঘটাইবার জন্য এই বিরাট জাতিসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় নাই—প্রত্যুত অত্যুদার সনাতন ধর্ম্মের পরিপুষ্টি ও সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতিসাধনই—এই জাতি সম্মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই পরিপুষ্টি ও সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি বিধান করিবার জন্য—এই মহাসম্মিলন যে উপায় অবলম্বন করিবে, তাহা সর্ব্বথা

শাস্ত্রানুমোদিত, আমাদের পরম পূজনীয় মহর্ষিগণের ও তাহা একান্ত অভিপ্রেত এবং তাহা সর্ব্বথা বর্ত্তমান সময়ের অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের আত্মসমাজের ও জাতির, শাস্ত্রসম্মত যে এই উদ্যম, তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে—ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য, তথাকথিত আস্তিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে সকল মত প্রচার করিতেছেন, সে সকল তাঁহাদেরই শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও দেশ-কাল-পাত্রের প্রকৃত স্বরূপানভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। তাঁহারা শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেন তাহা তাঁহাদের অজ্ঞান- ও অভিমান-বিজৃম্ভিত শাস্ত্রের অপব্যাখা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষ বশতঃ নিম্নস্তরের জাতি যে ক্রমে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম জাতিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে—ইহাই হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদিকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শিষ্টপরিগৃহীত শাস্ত্র হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথমে এই বর্ণবিভাগ আমাদের এই পুণ্য ভারতবর্ষে ছিল না, গুণ ও কর্ম্মানুসারে এক জাতিরই মানবগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা মহাভারতেই লিখিত হইয়াছে, যথা—

ন বিশেষো হস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।

বর্ণনিবহের মধ্যে কোন অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য নাই, এই জগৎ ব্রাহ্ম—কারণ ইহা প্রথমে ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট, একস্বভাবাপন্ন হইয়া প্রথমে উৎপন্ন মানবসমূহই কালক্রমে বিভিন্ন কর্ম্মসমূহের দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণতাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে এই বিশ্বে একটী মাত্র বর্ণই বিদ্যমান ছিল, কর্ম্মানুষ্ঠানের বৈলক্ষণ্য বশতঃই চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কি প্রকার কর্ম্মবৈলক্ষণ্যবশতঃ ব্রাহ্মণই ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে পরিণত হইয়াছে—তাহাও মহাভারতেই স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃবৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়াঃ লুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৪।১৮৮।

যাহারা কামভোগপরায়ণ—তীক্ষ্ণস্বভাব—ক্রুদ্ধস্বভাব ও সাহসপ্রিয় তাহারা ব্রাহ্মণোচিত আচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বর্ণে পরিণত হইয়াছে, ইহাদিগের অল্পরক্ত বর্ণ ছিল; যাহারা পীতাভ ও যাহারা গোপালন ও কৃষিকর্ম্মকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়াছিল, তাহারাই বৈশ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আর যাহারা বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ পরিত্যাগ করিয়াছিল, হিংসা ও মিথ্যা ব্যবহার যাহাদের প্রিয় হইয়াছিল এবং যাহারা কৃষ্ণবর্ণ তাহারাই শূদ্রবর্ণ

হইয়াছে। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অঙ্গীকার করা নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডেও লিখিত আছে—

মনুর্ম্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥

কশ্যপঋষির ঔরসে তৎপত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ জন্মিয়াছিল, এই মাতা মনুর সন্তানগণই মনুষ্য নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥

পুরাকালে বেদের বিভাগ ছিল না, সকলের পক্ষে একই বেদ ছিল। এবং সকলের পক্ষে প্রণব-উচ্চারণের ব্যবস্থা ছিল, সকলের উপাস্য দেবতা এক নারায়ণ ছিলেন, একই অগ্নি সকলের হোমাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, সকলেই একবর্ণপ্রবিষ্ট ছিল।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—

বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তু তে ॥

ত্রেতাযুগেই বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, সংহিতার বিভাগ ও সেই ত্রেতাযুগেই হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ ও ঋষিগণই এইযুগে মন্ত্রসমূহকে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

গুণ-কর্ম্ম-বিভাগানুসারেই আমি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি।

বায়ুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে—গৃৎস্নমদ নামক ক্ষত্রিয়ের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক. এই শৌনক ক্ষত্রিয় বংশজাত হইলেও তাহার পুত্রগণ নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। সেই বায়ুপুরাণের বচন যথা—

পুত্রোগৃৎস্নমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতাঃ বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।

বিষ্ণুপুরাণের ১।৮।৪ শ্লোকে এই বায়ুপুরাণের উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এই জাতীয় অনেক বচন থাকিলেও এস্থলে আর উদ্ধৃত হইল না। এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পুরাকালে একবর্ণ ছিল. একই ব্যক্তির সন্তানগণ কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে প্রবিভক্ত হইত, জন্মগত ব্রাহ্মণ্যাদির প্রচার তখন হয় নাই, পরবর্ত্তী যুগেই তাহা হইয়াছিল। মনু প্রভৃতি সংহিতাকার মহর্ষিগণের মতেও ব্রাহ্মণ যদি যথাবিধি উপনীত হইয়া ব্রতাদি পালন পূর্ব্বক রীতিমত বেদের অধ্যয়ন না করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বহু পুরাণে ও মহাভারতে জন্মগত ব্রাহ্মণ্যাদির ব্যবস্থাপক বহু বচনও দেখিতে পাওয়া যায়। গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থার দ্বারা সমাজসংস্কারের বিরোধিগণ ঐসকল বচন প্রচুরভাবে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, অনেকেরই মুখে ঐ সকল বচন প্রচুর ভাবেই শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল বচন যে প্রমাণভূত নহে ইহা বলিবার সম্ভাবনা নাই।

বহু বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্রে গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগের কথাও যেমন উপলব্ধ হয়, সেইরূপই বহু বচনে জন্মগত ব্রাহ্মণাদি

বিভাগের নির্দ্দেশও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ইহাই হইতেছে যে, এই সকল পরস্পরবিরুদ্ধ বচনসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? আমার বিবেচনায় এই বিরোধের সমন্বয় করিতে হইলে মনুষ্যসমাজের নিয়তপরিবর্ত্তনশীল অবস্থানিচয়কে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে দেখিতে হইবে, তাহা হইলেই এই সকল বিরোধের সুমীমাংসা অনায়াসে হইতে পারে।

সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মনুষ্যসমাজমাত্রেই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। শুধু উচিত নহে, অল্পবিস্তর ভাবে সকল সভ্য মানবসমাজের মধ্যেই এই বর্ণাশ্রমের প্রবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, ও যতদিন সভ্য মানবসমাজ পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিনই এই সনাতনধর্ম্মসম্মত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা প্রত্যেক সভ্য মনুষ্যসমাজে অল্পাধিকভাবে বিদ্যমান ও থাকিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যতি-রেকে কোন সভ্য সমাজই এসংসারে বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা এবং অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসরও হইতে পারেনা। জীবনের প্রথমভাগে সভ্য মানবসমাজে শিশুগণকে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন পূর্ব্বক অধ্যয়নের বিধি ব্যবস্থা মানিতে হইবে, সকল সভ্য সমাজই এই ব্যবস্থানুসারে এখনও চলিয়া থাকে। ইউরোপে বা আমেরিকায় সকল সভ্য জাতি নিজ নিজ বালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, ঐ কালে শিক্ষার্থী বালকগণ যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে পারে, তাহারা জন্য নিজ সামর্থ্য ও বুদ্ধি অনুসারে নিয়ম প্রণালীও বাঁধিয়া দিয়া থাকেন—ইহা ভিন্ন ভিন্ন সভ্য জাতির ইতিহাসজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

যৌবন উপস্থিত হইলে ও শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, সকল সভ্য সমাজেরই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্তদ্দেশীয় ব্যবস্থানুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতি-

পালন করিতে হয়। গার্হস্থ্য প্রতিপালনের পর, বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, পার্থিব বিষয়নিবহের সতত অসারতা ও দুঃখ-হেতুতা দর্শনে অন্তঃকরণ যখন বিরক্ত হইয়া উঠে—তখন ধীরে ধীরে পুত্র পৌত্রাদির নিকট হইতে দূরে যাইয়া—কোনও সুবিধাজনক নির্জ্জন স্থানের আশ্রয়ে, পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জীবনের শেষ সময় শান্তভাবে কাটাইবার জন্য প্রবৃত্তি, মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের শাস্ত্রসম্মত—বানপ্রস্থ—ও সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয়ের সদৃশ – আশ্রমধর্ম্মের স্ব স্ব প্রকৃতির অনুকূল ব্যবস্থা সকল সভ্যজাতির মধ্যে অল্পবিস্তরভাবে প্রাচীন কালেও ছিল, এখনও দেখা যায়।

সকল সভ্য সমাজের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—যে সকলে সব কাজ করে না, দেশকাল-পাত্র-শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে সকল মনুষ্য সমাজেই কার্য্যগত জাতিবিভাগ আপনা আপনিই হইয়া থাকে, তাহা না হইলে মনুষ্যসমাজ চলিতেই পারে না। কতকগুলি লোক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, শিক্ষাপ্রদান ব্যাপারে এবং অধ্যাত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্মচিন্তাশালী—স্বভাবতঃই সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ—সকল সভ্য সমাজেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের ত্যাগশীলতা, বিলাসবিমুখতা, ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি, অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্ত্তমানের অভ্রান্ত অনুভূতি সকল সভ্যসমাজের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। এই সকল কারণে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চানিরত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সকল সভ্য সমাজে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। সমাজ ইঁহাদিগের আদর করিয়া, গৌরব দেখায়, সম্মান করে, এবং ইঁহাদিগের স্বচ্ছন্দভাবে যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যে সমাজে এই শ্রেণীর

ব্যক্তিগণকে স্বচ্ছন্দভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না বা তাহাতে বাধা প্রদত্ত হয়, সে সমাজ কোন কালেই সভ্য মানব সমাজ বলিয়া পরিগণিত নহে, এখনও হইতে পারেনা। নানাকারণে অবশ্যম্ভাবী বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশও স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং স্বদেশেও উচ্ছৃঙ্খল, বলশালী অত্যাচারীর নিপীড়ন হইতে দুর্ব্বল, অসহায় ও বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য, নির্ভীক, উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ ও নিয়মাধীন বিশিষ্টশক্তিশালী একটী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সকল সভ্য সমাজেই আছে, অতীতে ছিল ও চিরদিনই থাকিবে। ভারত-বর্ষে এইরূপ কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত যে জাতি গুণকর্ম্ম অনুসারে গঠিত হইয়াছিল, তাহাই ক্ষত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাণিজ্য, কৃষি, গোপালন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জীবনধারণের উপায়স্বরূপ কার্য্যসমূহ করিবার জন্য সকল সভ্য সমাজেই একটি সম্প্রদায় বিশেষের স্থিতি, পরিপুষ্টি ও অভ্যুদয় একান্ত আবশ্যক। এই সম্প্রদায়কে বৈশ্য বলা যাইতে পারে; এই প্রকার বৈশ্য সম্প্রদায় সকল সভ্য সমাজেই আছে।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাহাদিগের সামর্থ্য নাই, এমন বহু লোক সকল সভ্যসমাজে সর্ব্বকালেই ছিল ও থাকিবে। তাহারা নিজের দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা অপরের সেবা করিয়া থাকে ও অপরের ধনার্জ্জনের পথকে প্রশস্ত করে। এইজাতীয় স্বভাবাপন্ন মানবসমূহ সেবক, দাস বা শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকল সভ্য সমাজেই এইরূপ সেবকের জাতি চিরদিন বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। ইহাই হইল স্বাভাবিক গুণ-কর্ম্মকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন মানবসমাজ থাকিতে পারেনা—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে কেবল হিন্দুজাতিরই

অসাধারণ ধর্ম্ম তাহা নহে। ইহা সকল সভ্য মানবসমাজেরই ধর্ম্ম—প্রাচীনকালে ছিল, এখনও আছে। যতদিন সমাজবদ্ধ হইয়া মানব এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সকল মানব সমাজেই এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে। ভারতবর্ষেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই বিষয়ে প্রমাণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ যতদিন অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতেছিল, ততদিন এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে গুণ-কর্ম্ম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহা আর্য্যগ্রন্থ হইতেই সমুদ্ধৃত প্রমাণসমূহের সাহায্যে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কালের বশে সামাজিক ব্যক্তিগণের অযত্নসিদ্ধ অধিকার-সুবিধাকে রক্ষা করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহের উদয় হইলে, দেশের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের, নিজ বর্ণের বা নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণকামনা স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। মোহের বশে, লোভের বশে, ভোগতৃষ্ণার বশে সামাজিক উচ্চস্তরের মানবগণ তখন ঐ সকল অনায়াসলব্ধ অধিকারকে ও সুবিধাকে বংশপরম্পরা-ক্রমে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে উদ্যত হয়। উচ্চস্তরের মানবগণ নিম্নস্তরের মানবগণকে ঘৃণা ও দ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করে, তাহাদের সুখদুঃখের খবর লওয়াকে অনাবশ্যক কার্য্য বলিয়া মনে করে, তখনই এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর গুণ-বা কর্ম্মগত থাকে না। তখনই ইহা জন্মগত হইয়া উঠে। এই জন্মগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে উচ্চস্তরের জাতিগণ স্বার্থপরতার বশে নিজ নিজ জাতির গৌরব ও প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বিধি-ব্যবস্থাকে বলপূর্ব্বক সমাজের মধ্যে চালাইয়া থাকেন, এবং উচ্চতর জাতির ছলে, বলে ও কৌশলে তাহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার বিরুদ্ধ বিধিব্যবস্থা যাহাকিছু প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অপব্যাখ্যার ও তখন

আরম্ভ হয়। গুণকর্ম্মগত বর্ণাশ্রমবিভাগ যে অশাস্ত্রীয় ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তখন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থান্ধ বহু গ্রন্থকারের দলও প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই হইল প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্যান্য দেশের মানবসমাজও এই নিয়মানুসারে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুসমাজে মানব প্রকৃতি এইভাবেই কার্য্য করিতেছে এবং চিরকালই করিবে। জন্মগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপিত হইবার প্রথম অবস্থায়, ভবিষ্যদ্দর্শী সমাজনেতৃগণ, ইহাতে সমাজে যে দোষের উদ্ভব হয়—তাহা ভাল করিয়া দেখিয়াছিলেন। সে দোষ কি? সে দোষ আর কিছুই নহে—জন্মগত অধিকারের অপব্যবহারই হইল সেই দোষ।

ব্রাহ্মণত্ব যদি জন্মগত হইয়া পড়ে, তহো হইলে সেই ব্রাহ্মণসন্তানের মধ্যে সকলেই যে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন-যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মের যথাবিধি প্রতিপালন করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ হয়। সাত্ত্বিক সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পুত্র কদাচার ও ব্যভিচারপরায়ণ হয়, অথচ সেই মূর্খ ও কদাচার পুত্র যদি ব্রাহ্মণোচিত গৌরব, সম্মান ও বৃত্তিলাভ করিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে সমাজে নানাপ্রকার অসহনীয় দুরন্ত অত্যাচারের সৃষ্টি হয়, একথা হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ ভাল করিয়া বুঝিতেন। তাই মহর্ষি মনু প্রভৃতি ঋষিগণ জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের রক্ষণার্থে উদ্যত হইয়াও জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের পরিণামে যে ভয়াবহ দোষ আসিতে পারে, তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁই মনুপ্রণীত ধর্ম্মসংহিতা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজাতি বেদের অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করে, সে এই জন্মেই নিজ বংশের সহিত শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তাই মহর্ষি অত্রিও বলিয়াছেন—

যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তংগ্রামং দণ্ডয়েদ্ রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ॥

যাহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও পরধর্ম্মে ব্যবস্থিত হয়, তাহাদিগের শাস্তিকারক নরপতি পূজিত হইয়া থাকেন। যে দেশে ব্রাহ্মণগণ ব্রতাচরণ করেনা, অধ্যয়ন করেনা, অথচ ভিক্ষালাভপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইদেশকে নানাপ্রকার বধদণ্ডের দ্বারা রাজা শাস্তি প্রদান করিবেন, কারণ ঐদেশ চোরকে খাইতে দেয়।

গৌতম বলিতেছেন—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

যে ক্ষমাশীল, যাহার ইন্দ্রিয় নিগৃহীত, যে দমপরায়ণ, যাহার ক্রোধ নাই, যে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিতে পারে, তাহাকেই ঋষি বলিয়া মানি—এরূপ গুণসম্পন্ন যাহারা নহে, তাহারাই স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

মহাভারতেও উক্ত আছে—

ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুস্কৃতপ্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততং স্থিরঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥

পাতিত্যের হেতু অসৎকর্ম্মসমূহের আচরণকারী, দাম্ভিক, বহু নিন্দিত কর্ম্মে ব্যাসক্ত যে ব্রাহ্মণ, সে শূদ্রসদৃশ, আর যে শূদ্র দম, সত্য ও ধর্ম্মে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিয়া থাকি—যাহার বৃত্ত আছে, সেই দ্বিজ হইয়া থাকে।

জন্মগত বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সকল অনিবার্য্য দোষ আসিয়া সমাজ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার পরিহার করিতে হইলে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে ব্রাহ্মণ বৃত্তসম্পন্ন নহে তাহাকে ব্রাহ্মণকুল হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্ত পালন করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত বিপরীত আচার করিয়া থাকে—তাহাকেও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এইরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান না করিলে জন্মগত বর্ণব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশই সাধিত হইয়া থাকে। জন্মগত বর্ণব্যবস্থার দ্বারা সমাজকে অভ্যুদয়ের পথে পরিচালিত করিতে হইলে, অত্যাচারীকে, অসমর্থকে, অজিতেন্দ্রিয়কে, সেই সেই উচ্চ বর্ণ হইতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করিতে হইবে, ইহাই হইল ঐসকল ঋষিবচনের তাৎপর্য্য।

বহুকাল হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দু, জন্মগত বর্ণব্যবস্থা মানিয়াও, জন্মগত বর্ণব্যবস্থার দোষ হইতে আত্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ঋষিগণের প্রদত্ত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। অত্যাচারী পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু প্রভৃতিকে অনুচিতভাবে রক্ষা করিতে যাইয়া সে ঋষিগণের ব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়াছে, তাহার এই অবিমৃষ্যকারিতা ও এই স্বার্থপরতার পরিণামই হইতেছে আজ ভারতে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিপর্য্যয়। আজ ভারতে 'ব্রাহ্মণ' নাম আছে মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সহস্রের মধ্যে একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'ক্ষত্রিয়'ও নাম মাত্র

আছে, কিন্তু হাজার করা একটীও ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বৈশ্যেরও নামই শুনা যায়, কিন্তু বৈশ্যধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি সমাজে নিতান্ত দুর্লভ। এই ধর্ম্মবিপ্লব আমরা নিজেরাই করিয়াছি। অথচ এই বিপ্লবের নিবারণ করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করে, যাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ সমাজের সকলের সম্মুখে আনিতে চাহে, আমরা তাহাদিগকেই সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী প্রভৃতি কটূক্তির দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহাই হইল বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের অবস্থা। এই ভীষণ দুরবস্থা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলার শিক্ষিত হিন্দুজাতি আজ জাগিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের অবাধপ্রসারে তাহারা নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত, আচার, শৌর্য্যবীর্য্য ও অতীত গৌরবের কথা মুদ্রিত প্রাচীন শাস্ত্রের পাঠদ্বারা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে মানবের সমাজ মানবেরই ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীল সমাজকে অভ্যুদয়ের পথে লইয়া যাইতে হইলে দেশ, কাল, পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলভাবে নূতন নূতন আচার গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রাচীন আচার যাহা দেশ, কাল, পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূল, সে সকল উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় যতশীঘ্র সম্ভব পরিবর্জন করিতে হইবে। পূজনীয় ঋষিগণ সমাজ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিতে যাইয়া এই কথাই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তাই মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন—

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বপরে স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ত্বন্য এবোক্তাঃ কলাবন্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

সত্যযুগের ধর্ম্ম একপ্রকার ছিল, ত্রেতাযুগে তাহার পরিবর্ত্তন

হইয়াছিল, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন এবং কলিযুগের ধর্ম্ম ঐ সকল যুগের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্।

তাই মহর্ষি পরাশরও বলিয়াছেন—

যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মা স্তেষু তেষু চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে স্মৃতাঃ॥

যুগে যুগে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, এবং দ্বিজাতিগণ যুগানুরূপ ধর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, সেই যুগধর্ম্মকে এবং যুগানুরূপ আচারের গ্রহণকারী দ্বিজাতিকে নিন্দা করিবে না, কারণ ঐ ধর্ম্ম ও দ্বিজাতি যে যুগে বিদ্যমান থাকেন, সেই যুগের অনুরূপই হইয়া থাকেন।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং
বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণঃ জঘন্যংবর্ণমাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ॥

হীনবর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা—জন্মগত জাতি পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ—উচ্চবর্ণও জঘন্যকার্য্যে নিরত হইলে উচ্চজাতি পরিবর্ত্তনবশতঃ নিম্নবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে।

মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনো শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

শীলসম্পন্ন গুণবান্ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে—আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে শূদ্র হইতেও নীচ হইয়া থাকে।

মনুও বলিয়াছেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।

কর্ম্মবশতঃ শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্নুয়ুঃ।

১৬।৫৩ ব্রহ্মপর্ব্ব।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শিবপুরাণেও লিখিত আছে—

এভিশ্চ কর্ম্মভি র্দেবি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্॥

এই পূর্ব্বকথিত অসাধু ও সাধুকর্ম্মের দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ নিম্নজাতিতে পরিণত হয় এবং শূদ্রও বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিরত ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা সনাতনধর্ম্মের মূলীভূত প্রমাণ শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে—ইহাই হইল ঋষিগণের মত। তাই শাস্ত্রে আছে—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্‌বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের বিস্তার করিবে। যে ইতিহাস ও পুরাণাদির জ্ঞানবান্ নহে, এইরূপ অল্পশ্রুত ব্যক্তিকে 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে', এইভাবে বেদ ভয় করিয়া থাকে।

ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই জাতীয় বচন রাশি রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ঐ সকল বচন আর উদ্ধৃত করিয়া এই বিস্তৃত অভিভাষণের আকার আজ বাড়াইব না। গুণের

দ্বারা, সৎকার্য্যের দ্বারা ও সদাচারের দ্বারা, নিম্নস্তরের বর্ণ উচ্চস্তরের বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই হইল সনাতন ধর্ম্মের অনাদি কাল হইতে প্রচলিত দৃঢ় সিদ্ধান্ত। এবং উচ্চতর বর্ণও স্ববর্ণোচিত আচারে বর্জ্জিত হইলে, গুণহীন হইলে, অসদাচারপরায়ণ হইলে, সেইরূপই নিম্নস্তরের বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে—ইহাও হইল সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের অখণ্ডিত সিদ্ধান্ত। হিন্দুসমাজের ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয় সাধন করিতে হইলে, এই সিদ্ধান্তের গ্রহণ আবার করিতেই হইবে। এ সিদ্ধান্ত কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে গ্রহণ করিলে পাপ হইবে বা ধর্ম্মহানি হইবে—এরূপ কোন কথাই হিন্দুশাস্ত্রের কুত্রাপি লিখিত হয় নাই। গুণ কর্ম্ম ও আচারের পরিবর্ত্তন দ্বারা বর্ণপরিবৃত্তি হইয়া থাকে, উচ্চবর্ণ অধমবর্ণে পরিণত হয়, আবার অধমবর্ণ উত্তমবর্ণে পরিণত হয়। সুতরাং এইরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে হইত—এখন আবার তাহা হইবে না কেন? না হইবার কোন হেতু প্রতিকূল পক্ষ এ পর্য্যন্ত দেখাইতে সমর্থ হয়েন নাই।

সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগের যে ধর্ম্ম ছিল, কলিযুগেও যদি তাহার নিষেধ না থাকে, তবে সে ধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়েও শাস্ত্রানুসারেই আমরা গ্রহণ করিতে অধিকারী। এই গুণকর্ম্মগত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিবর্জ্জনের ফলে হিন্দুসমাজ আজ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, মুমূর্ষু হইয়াছে, মরণের বিশাল দ্বার ক্রমশঃই তাহার জন্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। এই মুমূর্ষু জাতির অভ্যুদয়ের জন্য—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য—এই সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। কলিবর্জ্জ্য ধর্ম্মের মধ্যে আমরা এই গুণানুসারে বর্ণপরিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাই না। ঋষিরা কোথায়ও এ কথা বলেন নাই যে কলিযুগে গুণ ও আচার অনুসারে বর্ণপরিবৃত্তি নিষিদ্ধ বা ধর্ম্মহানিকর। সুতরাং আমাদের এই

জাতীয় জাগরণের শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গের সমগ্রজাতি একত্র হইয়া, বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া, নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে হিন্দুর পুনরভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ স্বরূপ, এই গুণকর্ম্মগত, বর্ণ ব্যবস্থা অঙ্গীকার করুন, এ বিষয়ে দেশের লোকের মধ্যে যে ভ্রান্তি বা সংশয় আছে তাহা দূর করিয়া সত্যের প্রকৃত স্বরূপ ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ সমাজে পুনঃ স্থাপিত করুন ও হিন্দু জাতিকে মরণের আসন্ন কবল হইতে রক্ষা করুন—ইহাই হইল আমার এই মহাসভায় সমবেত সমগ্র বঙ্গের হিন্দুজাতির প্রতিনিধি বর্গের নিকট ঐকান্তিক ও বিনীত নিবেদন।

এই শাশ্বত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে শ্রীভগবানের শরণ লইতে হইবে, অকপট ভাবে সকল প্রকার অভিমান বর্জ্জন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে।

তিনি যে নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি কৃপা করিবেন—একথা আজ বাঙ্গালীকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াসের কোন আবশ্যকতা নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এইরূপ বিপর্য্যয়, এইরূপ অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও তন্নিবন্ধন রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষ্যার প্রচণ্ড দহনের ভীষণ জ্বালায় চারিশত বৎসরপূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ যখন মরণের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন ভক্ত চূড়ামণি বিশ্বপ্রেমিক আচার্য্য অদ্বৈতের সাধনায় ও আহ্বানে সেই গোলোকের অধিপতি পতিতপাবন সার্ব্বজনীন প্রেমের অকুলপাথার শ্রীভগবান্ আমাদেরই দেশে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদেরই আপনার জন হইয়া আসিয়াছিলেন। আসিয়া বিশ্বে প্রেমের প্লাবন বন্যা বহাইয়াছিলেন। সেই বন্যায় ভাসিয়া বাঙ্গালী নরনারী, সজ্জন, দুর্জ্জন, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়াছিল, তৃণ অপেক্ষাও নত হইয়াছিল, অজ্ঞানকল্পিত অভিমানবিজৃম্ভিত সমাজের সর্ব্বনাশকর উচ্চনীচভাব দূরে বিসর্জ্জন করিয়া মানুষ হইয়া-

ছিল। চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। নীচও মহান্ হইয়াছিল। উচ্চনীচভাব ভুলিয়া গিয়া সকলে সকলকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছিল। কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মদিন আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই পুণ্য পূর্ণিমায় তাঁহারই কর্ম্মপ্রণালী, তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি, তাঁহারই বিশ্বজনীন প্রেমসূর্য্যের অপার্থিব স্নিগ্ধ শান্তিময় আলোক আমাদিগের গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিবে, বঙ্গে সমাজগত অশান্তি ও বিপ্লব চিরদিনের জন্য বিধ্বস্ত হইবে এবং তাঁহারই অভিমত গুণকর্ম্ম-স্বভাব-নিয়ত বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাঁহারই কৃপায় আবার এই বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা আজ এই সুপবিত্র মহামিলন মণ্ডপে মিলিত হইয়াছি এবং তাঁহারই অভিপ্রেত কার্য্য করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি—ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি।

গুণকর্ম্মগত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও যথাবিধি তাহার পালন ব্যতিরেকে মানব বিশ্বাত্মা প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম-ভক্তিরূপ পঞ্চম বা চরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইতে পারে না—ইহাই হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মত। তাহা বৈষ্ণব মাত্রেই বিদিত আছেন। তাই প্রেমভক্তিসম্পন্ন সহজবৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখে ভক্তিব্যাখ্যা শুনিবার ব্যপদেশে তিনিই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে স্বদ্ধা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥

এই বর্ণাশ্রমাচার, শ্রীগৌরাঙ্গদেবসম্মত এই বর্ণাশ্রমাচার, যে কেবল জন্মমাত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা নহে, কিন্তু ইহা গুণকর্ম্মবিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণেব সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেন তাহা বলি। যাঁহাকে নিমিত্তীভূত করিয়া শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেব পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত প্রথমে

প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই পরম পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী স্বকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু বীক্ষণাৎ ॥—

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার অর্থ—যাঁহার (অর্থাৎ শ্রীভগবানের) নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, যাঁহাকে প্রণাম করিলে, যাঁহাকে স্মরণ করিলে, চণ্ডালও সদ্যঃ ব্রাহ্মণাদিদ্বিজাতিকর্ত্তব্য শ্রৌত যাগাদিকর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়া থাকে, হে ভগবন্! মানব তোমার কৃপায় যদি সাক্ষাৎ তোমার দেখা পায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অধিক বলিবার কি থাকিতে পারে? এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বর্ণন দ্বারা তিনি ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন যে, হরিভক্তির উদয় হইলে, এই জন্মেই চণ্ডালাদি একান্ত অস্পৃশ্য জাতিও যাগাদি বৈদিক ক্রিয়ায় অধিকারী হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার জন্মলব্ধ যে নীচ জাতি তাহা সদ্যই বিদূরিত হয়। হরিভক্তিবিলাস নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

এই প্রামাণিক বচনটীর দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, রসবিধানানুসারে কাংস্য যেমন সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিধিবৎ বৈষ্ণব দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্যমাত্রই দ্বিজত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বও লাভ করিয়া থাকে। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ স্পষ্টই

বলিয়াছেন যে, যে কোন মনুষ্যই হউক না কেন সে বিহিত দীক্ষার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে।

দীক্ষা লাভ করিয়া, যে সাধক ভক্তিমার্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে—সেই ব্যক্তি নীচ জাতি বলিয়া আর সমাজে পরিগণিত হয় না। তাহার দান গ্রাহ্য, সেও প্রতিগ্রহে অধিকারী হইয়া থাকে। এইরূপ প্রভূত প্রমাণ বৈষ্ণব গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, দিঙ্‌মাত্রই প্রদর্শিত হইতেছে,—

ন মেঽভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

—হরিভক্তি বিলাস।

চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি অভক্ত হয়, তবে সে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু চণ্ডালও যদি ভগবদ্‌ভক্ত হয়, সেও আমার প্রিয় হইয়া থাকে। সেই ভক্ত চণ্ডালকে দান করিবে এবং তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহও করিবে।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

হে ভগবন্, যে সর্ব্বদাই মনে আপনাকে স্মরণ করিয়া, আপনার নাম জিহ্বাগ্রে রাখিয়া থাকে, সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত, আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সমস্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সমস্ত যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ আর্য্য হইয়া থাকেন;

ভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি করিলে চণ্ডালত্ব নিবৃত্ত হইলেও, এই জন্মেই তাহার যজ্ঞাদি কার্য্যে অধিকার হয় না, কিন্তু জন্মান্তরে সে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যে অধিকারী হয়—এই প্রকার মত কোন কোন জাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের একান্ত বিরুদ্ধ। কারণ শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদই দুর্গমসংগমনী নামক গ্রন্থে ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময়সাবিত্র্যজন্মসাপেক্ষত্বাৎ ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবন-যোগ্যত্বপ্রাতিকূল্যদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারা-ভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তি ইতি ব্রাহ্মণকুমারাণাঃ সবনযোগ্যত্বাভাবব্যবচ্ছেদকসাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবদ্ অস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্যজন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততইতিভাবঃ। দুর্গম-সঙ্গমনী পূর্ব্ববি ১।১৩।

ইহার অর্থ—ব্রাহ্মণ কুমারগণের পিতৃমাতৃলব্ধ শৌক্র জন্মে দুর্জ্জা-তিত্বের অভাব থাকিলেও, যেরূপ যাগাদি কার্য্যে যোগ্যতা বা অধিকার লাভের জন্য উপনয়নরূপ সাবিত্র্য পুণ্যবিশেষকর জন্মলাভের আবশ্যকতা আছে—অর্থাৎ শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ করিয়া উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিজকুমারগণ যেমন যজ্ঞ করিতে অধিকারী হয় না—সেইরূপ চণ্ডালকুলোৎপন্ন অদীক্ষিত ব্যক্তির ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীভগবন্নামোচ্চারণাদি মাত্রেই দুর্জ্জাতির আরম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হওয়া নিবন্ধন বিশুদ্ধ জন্মলাভ হইলেও, যজ্ঞাদিকার্য্যে অধিকারলাভের হেতু সাবিত্র্যজন্মস্বরূপ দীক্ষালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার হয় না, কারণ এরূপ শিষ্টাচার নাই। কিন্তু দীক্ষারূপ সাবিত্র্য জন্মলাভ হইলে তাহারও যজ্ঞাদিতে

অধিকার হয়, এই কারণে নামগ্রহণনিরত অদীক্ষিত চণ্ডালাদিরও দীক্ষারূপ সাবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা আছে—ইহাই তাৎপর্য্য।

অভিভাষণ বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া অদ্য এইখানেই আমি উপসংহার করিতে বাধ্য হইতেছি।

তাই আর অধিক শাস্ত্রীয় বচন এখানে উদ্ধৃত করিব না। আমি ইহাই আপনাদের নিকট বিনীত ভাবে জানাইতেছি যে, আমাদের এই সর্ব্বনাশকর জাতিবৈষম্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদিগকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করিতে হইবে, কলিযুগে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদি মহাধর্ম্মের আশ্রয় করিতেই হইবে, আমাদের জাতিগত উচ্চনীচ ভাব ও তৎপ্রযুক্ত হিংসা, দ্বেষ ও অহঙ্কার সত্যসত্যই ছাড়িতে হইবে। ভগবানের সেবক হইতে হইলে, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে, সকল মানবদেহে অংশরূপে প্রবিষ্ট সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীমন্দির বিবেচনা পূর্ব্বক, জাতিবর্ণকুলনির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই ভাবের সাধনাই হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবসাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলেই মানব প্রেমভক্তির রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। তখনই মানব গুণকর্ম্ম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রহস্য ও মহিমা বুঝিতে সমর্থ হয়। আচার্য্য প্রবর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি যবন শ্রীহরিদাসকে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বরণীয় আসনে আদর করিয়া বসাইয়া শ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন ব্রহ্মণ্যদেব-বোধে ভোজন করাইয়াছিলেন, এবং এইরূপ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ডাকে, তাঁহার ক্রন্দনে তাঁহারই ভক্তিসচন্দনমিশ্রিত তুলসীপত্রের প্রভাবে

গোলোকের পতি শ্রীভগবান্ প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া, প্রেমভক্তিবন্যায় তাঁহাকে, তাঁহার দেশকে, তাঁহার জাতিকে ও সর্ব্বশেষে সমগ্র ভারতবাসীকে ভাসাইয়া, এই শোক, তাপ, দ্বেষ, হিংসা, জরা, ব্যাধি, কলহবিষে জর্জ্জরিত হিন্দুজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুণ্য জন্মদিনে আজ সমগ্র বাঙ্গলার সমবেত হিন্দুজাতি সংমিলিত হইয়া তাঁহারই পুণ্য নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এই শুভ মিলনমুহূর্ত্তে—পুনর্জ্জীবন লাভ করিবার জন্য, সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য, জগতের বরণীয় সভ্যজাতির মধ্যে বরণীয় উচ্চ আসনে বসিবার জন্য, সর্ব্বশেষে ভক্তলীলাক্ষেত্র—আদর্শ মনুষ্যগণের ক্রীড়া-নিকেতন—সর্ব্ব সম্পদ্‌যুক্ত স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী বঙ্গভূমিতে হিন্দু হইয়া জন্মলাভের অসাধারণ সৌভাগ্যকে পরিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য—শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরই প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তির সাধনায় দীক্ষিত হইবার সংকল্প করিতেছে। দীনদয়াল পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর গোলোক হইতে হাসিতে হাসিতে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—বাঙ্গালী হিন্দুর এই বিজয়যাত্রা নিশ্চয়ই সাফল্য মণ্ডিত হইবে। ইহাই হইল এই অধম অকিঞ্চন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এ জীবনের আশা ও ভরসা।

বাংলার বিভিন্ন জাতিসমূহের প্রতিনিধি ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদিগের নিকটে সর্ব্বশেষে আমার আর একটী নিবেদন আছে। তাহা এই—

শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত প্রেমময় বিশ্বজনীন ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ পথেই আমাদিগকে চলিতে হইবে। সে পথে চলিতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার সেই পবিত্র উপদেশবাণী ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে—যে বাণী তিনি বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী

কায়স্থ-পুত্র বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীকে প্রেমভক্তির পথ দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলেন।

"গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে,
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত।

পরপদানত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, অজ্ঞানান্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া মরণের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে জাতি, আপনাকে পর করাই আজ যে জাতির ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আসুরবলসম্পন্ন পরের সেবাব্যতিরেকে যাহাদের বাঁচিবার অন্য উপায় নাই, সেই জাতির এই মৃত্যুকল্প দারুণ দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় ভাল খাওয়া নহে, ভাল পরাও নহে, যৎসামান্য ধনসঞ্চয় করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত মোকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইবার অনুকূল পুরুষকারও নহে, পরের নিন্দা বা আত্মপ্রশংসারূপ শুষ্ক গ্রাম্যবার্ত্তা শুনা বা শুনানও নহে। যাহাদের ঘরে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাবার জুটে না, যাহাদের দুর্লভ অন্নের পবিত্রতা রক্ষা করিবার কোন শক্তি নাই, অশনে, বসনে, ভূষণে, জীবিকানির্ব্বাহে প্রতিপদেই যাহাদের পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিষয়ভোগলালসার করাল পিশাচীর আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাই আমাদিগকে আজ সত্য সত্যই ভাল খাইবার ভাল পরিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যাহাদিগের মধ্যে শতকরা আশীজন সত্য সত্যই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের মধ্যে বাকী বিশ জন লোক যথেচ্ছ-ভোগ পিপাসা মিটাইবার জন্য ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, গাড়ীতে

চড়িবে, ইহার নামই নৃশংসতা। ইহা অপেক্ষা জাতির শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে? যাহারা খাইতে পায় না, যাহারা শীতনিবারণের বস্ত্র জুটাইতে পারে না, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যাহাদের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক সদসৎবিবেকের অনুকূল উদার জাতীয় শিক্ষা পায় না, তাহাদিগের যাহারা নেতৃত্ব করিবে, তাহাদিগকে যাহারা উন্নতির পথ দেখাইবে, তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় সঙ্ঘশক্তিকে যাহারা জাগাইবে, তাহাদিগকে স্বজাতির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী হইতে হইবে, জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। নিজের জাতিকে, নিজের সমাজকে নিজের সংসার করিয়া তুলিতে হইবে, এইরূপ মনোবৃত্তি যদি আমাদিগের মধ্যে না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য যাহা কিছু চেষ্টা সবই নিষ্ফল হইবে; সকলই অরণ্যে রোদনমাত্রে পরিণত হইবে।

এ বিলাসের বাসনা, এ আত্মসুখের কামনা, এ স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে চাকচিক্যময় বসনভূষণপরিচ্ছদে সাজাইবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, আমাদিগের হৃদয়ে যতদিন থাকিবে ততদিন এদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সেই প্রেমের বাতাস বহিবে না। যে প্রেমের বন্যার জীবন্ত চিত্র বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ভাবুক ও ভক্তকবি বৈষ্ণব কবি-সম্রাটের অমরভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—সে বর্ণনা যাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, সে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য হইতে পারে না।

উছলিয়া প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি; নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে ॥

চৈতন্য চরিতামৃত

বাঙ্গলার হিন্দুজাতিসমূহের মধ্যে একতা, ভালবাসা ও শক্তির সাধনা করিতে হইলে গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মৃতসঞ্জীবনী-সুধারূপ প্রেম বন্যায় সকল জাতি মিলিত হইয়া ভাসিতে হইবে, সকল প্রকার উচ্চ নীচ-ভেদ ও অমূলক বৃথা অভিমান, হিংসা, দ্বেষ দূরে ফেলিয়া দিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, ইহা যদি কখনও আমরা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের এই সর্ব্বজাতিসম্মেলন সার্থক হইবে; সেই সার্থকতার একমাত্র সাধন যে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণারবিন্দযুগলে সর্ব্বতোভাবে সমাশ্রয়, ইহা যেন সর্ব্বদা আমাদের মনে থাকে।

"সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণিসুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরোদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥"

সমবেত প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!
ইহাই হইল আমার আপনাদের নিকট শেষ নিবেদন।
জয় পতিতপাবন দীনশরণ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়।

আসাম-প্রাদেশিক হিন্দুসভার

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন



শিবসাগর

সভাপতির অভিভাষণ

আসাম প্রদেশের দ্বিতীয় বার্ষিক হিন্দু সম্মেলনে আপনারা আমাকে সভাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া আমাকে যে অসামান্য সম্মানদান করিয়াছেন তাহাতে আমি বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছি—এবং সেই জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

ভারতের ইতিহাসে আসামপ্রদেশ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা ভগবদ্‌ভক্তি-প্রবণতা ও সরলতাপ্রমুখ-গুণরাশি-সমুদ্‌ভূত কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় চিরসমুজ্জল। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট প্রদেশে প্রথমে জননীজঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি, পরমভাগবত শ্রীশঙ্করদেব গোস্বামি-পাদ এই আসাম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশে যে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে এখনও আসামবাসিগণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্ট গৌরবাবহ স্থান অধিকার করিয়া এ প্রদেশে এখনও

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আসামের মহাতীর্থ মহাপীঠে শ্রীশ্রীকামাখ্যাপুরীতে অনাদিকাল হইতে ভারতের সকল প্রদেশের শক্তি-সেবক অগণিত ভক্ত নরনারীনিবহ প্রতিবর্ষে দলে দলে আগমন করিয়া চিদানন্দময়ী—জগজ্জননীর রাতুল পদ-পঙ্কজে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত জবা-বিল্বপত্রাঞ্জলি দানপূর্ব্বক মানবজন্মের সাফল্য বিধান করিয়া থাকে। সেই বহুতীর্থমণ্ডিত এই আসাম-প্রদেশের দ্বিতীয় বার্ষিক হিন্দুসম্মেলনে সম্মিলিত হইয়া আমরা যে কার্য্য সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারিব, তাহার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রথমেই আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।

এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যাহা না করিলে চলে না, আমরা অর্থাৎ বিশাল ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাই করি না। শুধু তাহা নহে—আমাদের মধ্যে যদি কেহ বা কাহারা তাহা করিবার জন্য উদ্যত হয়, আমরা তাহাতে বাধা প্রদান করিবার জন্য উদ্যত হই। আমরা বাধা প্রদান করাকেই পরম পুরুষার্থ বলিতে লজ্জাবোধ করি না। এই প্রকার বিচিত্র বিস্ময়াবহ মনোবৃত্তি পৃথিবীতে অন্য কোন সভ্য জাতির দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতির মরণের পথকেই আজ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দ্বারা অমৃতের সন্ধান বলিয়া অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। এই বিষম ভ্রান্তি যদি কেহ সাহস করিয়া দেখাইতে চাহে তাহাকে ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, কালাপাহাড় প্রভৃতি মুখরোচক গালি দেওয়াকেই আমরা হিন্দুত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ঘোষণা করিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।

এই ভগবদ্‌বাক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজ বিশাল হিন্দুজাতিই

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই নাম দাসোচিত মনোবৃত্তি বা slave mentality। এই হিন্দুর সর্ব্বনাশকরী দাসোচিত মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য হিন্দু মহাসভা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কথাই বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। মোট কথা হইতেছে ইহাই যে, বর্ত্তমান সময়ে এ সংসারে হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দুই—বাহিরের কোন শত্রু হিন্দুর কেহ আছে বা থাকিলেও যে হিন্দুর কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে—এ বিশ্বাস আমার নাই। হিন্দুর অন্তঃশত্রুই হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কেন যে এ বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। আপনারা একটু ধীরতার সহিত তাহা শুনিলে আমি অনুগৃহীত হইব।

সকলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-আচার শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্র যাহা নিষেধ করে, বা শাস্ত্রসম্মত আচারের যাহা বিরুদ্ধ আচার, তাহা হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য নহে—তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে আমাদের বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়া যাইবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অধঃপাতে যাইবে, ইহকাল ও পরকালে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জাতির অস্তিত্ব ও সকল উন্নতির কারণ সঙ্ঘশক্তিকে ফিরাইয়া আনিতে এবং সমুদ্দীপিত করিতে হইলে, যে সকল নূতন পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তাহা যাঁহারা কায়মনোবাক্যে চাহেন, তাঁহারা শাস্ত্রবিরোধী বা শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর নহেন। প্রাচীনপন্থিগণ কিন্তু, বলিয়া থাকেন যে, নূতন আচারের অঙ্গীকার সর্ব্বথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা সর্ব্বপ্রকারে পরিহার্য্য। এই যে পরিবর্ত্তনকামী নব্যপন্থী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী প্রাচীনপন্থীর পরস্পর মতভেদ, ইহাই হইল হিন্দুসমাজের সকল প্রকার অভ্যুদয়ের প্রতিকূল। এই মত-বৈষম্য নিরাকরণ করিতে না

পারিলে আমরা সঙ্ঘশক্তি ও সংগঠনকে জাগাইতে পারিব না—ইহা প্রাচীনপন্থীও বুঝেন, নব্যপন্থীও বুঝেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে পথে চলিলে এই সর্ব্বনাশকর মত-বৈষম্য দূর হইতে পারে, সে পথে আমরা চলিতে চাহি না, আপনার মত বজায় রাখিবার চেষ্টাকেই আমরা পৌরুষ বলিয়া বিবেচনা করি। সত্য কি তাহা বুঝিয়া, নিজমত পরিবর্ত্তন করাকে আমরা কাপুরুষতা বলিয়া মানিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে পারি না।

ইহা সত্য সুতরাং অপরিহার্য্য—ইহা বুঝিবার ও বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার শক্তি যে জাতির লুপ্ত হয়, তাহার ধ্বংস যে অনিবার্য্য ইহা কে অস্বীকার করিবে?

হিন্দুশাস্ত্র অগাধ অতলস্পর্শ ও অপার-বারিধি-কল্প। সংস্কৃত ব্যাকরণে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা ন্যায়শাস্ত্রের কিংবা স্মৃতিশাস্ত্রের খানকয়েক হাজার বৎসরের মধ্যে সমুদ্ভূত পুঁথিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলেই যে হিন্দুর সেই শাস্ত্রবারিধির পার লাভে কেহ সমর্থ হয়, এ বিশ্বাস যাঁহার এখনও মনে আছে, তিনি হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে নিতান্ত একদেশদর্শী। তাঁহার মতানুযায়ী ব্যক্তিগণের দ্বারা এই আত্মহারা, বিপর্য্যস্ত, আত্ম-বিনাশোদ্যত হিন্দুজাতির কোন অহিত-প্রতিবিধান বা উন্নতিসাধন হইতে পারে না, ইহা এখনও যে হিন্দু না বুঝিয়াছে, তাহার ন্যায় হতভাগ্য যে সর্ব্বথা শোচনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

হিন্দুশাস্ত্র যেমন অতিবিস্তৃত, তেমনি ইহার তাৎপর্য্যও দুরধিগম। এক হাজার বা বারো শত বৎসর হইতে ঐ শাস্ত্রসমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা হইয়া আসিতেছে, সেই ব্যাখ্যাই যে সর্ব্ববাদিসম্মত তাহা বলিতে পারা যায় না। দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ নূতন নূতন ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। সুতরাং কোনও ব্যাখ্যাগ্রন্থই কেবল প্রাচীনতা বশতঃ যে সর্ব্বাংশে সকলের সম্মত হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না।

শাস্ত্র কাহাকে বলে? যাহার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক হিতকর বস্তু উপদিষ্ট হয়, তাহাই তো শাস্ত্র! শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিয়া থাকি, কোন্ বস্তু ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখপ্রাপ্তির হেতু। তাহা জানিয়া আমরা সুখসাধনের অনুষ্ঠান করি বা দুঃখসাধনের অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হই। হিন্দুর পক্ষে এই শাস্ত্র বলিলে শ্রুতি, স্মৃতি, পূরাণ, তন্ত্র এবং রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থকেই বুঝায়। এই বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মধ্যে যাহার নাম শ্রুতি বা বেদ, তাহাই অপৌরুষের, অর্থাৎ হিন্দুগণের মতে কোন লৌকিক পুরুষ বা জীব কর্ত্তৃক রচিত নহে। সেই বেদই মূল প্রমাণ। এই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য কি—তাহা বুঝাইবার জন্য মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে, ইহাই হইল আস্তিকগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঐসকল ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপ শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মতভেদ-নিরাকরণ করিয়া বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে যুক্তিরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে মহর্ষি মনু যে সর্ব্বপ্রধান—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই মনুই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন, যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া তবে ধর্ম্মের

স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। প্রাচীন পন্থিগণ বলেন যে, এই যুক্তি লৌকিক যুক্তি নহে, কিন্তু ইহা মীমাংসাশাস্ত্রপ্রদর্শিত যুক্তি, সেই যুক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মনির্ণয় করিতে সমর্থ। সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ যুক্তির দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ বুঝা মনুর অভিমত নহে। সংস্কারবিরোধী প্রাচীন পন্থিগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত কিন্তু, মনুর অভিপ্রেত হইতে পারে না—কারণ মনু স্বয়ং এই যুক্তিশব্দের কি অর্থ তাহা নিজমুখে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥”

বেদশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে যে ব্যক্তি ঋষিবচন ও বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে প্রয়াস করে, সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারে, অপরে নহে। এই মনুবচনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যে তর্ক বেদশাস্ত্রের অবিরোধী, তাহার দ্বারাই ধর্ম্মোপদেশসমূহের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, বেদশাস্ত্রের অবিরোধী লৌকিক তর্ক গ্রহণ করিবে না।

সুতরাং মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত-তর্ক-ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার বেদ প্রামাণ্যের অবিরোধী তর্ক আশ্রয় করিলে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না, এই প্রকার প্রাচীনপন্থিগণের ধারণা সর্ব্বথা অমূলক। ফল কথা হইতেছে ইহাই যে, হিন্দুধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত নহে, হিন্দুধর্ম্মের যাহা মূল তত্ত্ব তাহা অপৌরুষের বেদবাণীর দ্বারা অন্যান্য সকল ধর্ম্ম প্রচারের বহুপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। সে ধর্ম্ম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন বিভাগে বিভক্ত। যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে, ঐহিক সৎ বা অসৎ কর্ম্মের ফল পরলোকে ফলিয়া থাকে; দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে আত্মা অত্যন্ত ভিন্ন, সেই আত্মার অবিদ্যাকৃতি অবিশুদ্ধ

ভাব দূর করিবার জন্যই আত্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে; জীবের সেই পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ বুঝিয়া ভগবানের অভিপ্রেত কর্ম্মদ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া সংসারের সকল প্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকেই উপাসনা মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—এইরূপ বিশ্বাসই হিন্দুত্বের মূল ভিত্তি। এইরূপ হিন্দুত্ব বা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শ্রুতির দ্বারা অনাদিকাল হইতে উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। বেদোপদিষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের প্রতি যাহার আস্থা আছে, ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে যে কোনও জাতিতে বা যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেও হিন্দু। তাহাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে, হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে, প্রাচীন ভারতবর্ষে শিষ্ট সমাজের মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি যে ছিল, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—সমগ্র বেদশাস্ত্রের মধ্যে এমন একটি বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা জন্মতঃ অহিন্দু, তাহাদের হৃদয়ে হিন্দুভাব জাগিয়া উঠিলে, হিন্দুসমাজের মধ্যে তাহাদের প্রবেশ হইতে পারে না এইরূপ উপদেশ প্রাচীন কোন শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যস্থাপনের বহুপূর্ব্বে যখন হিন্দু বাঁচিয়া ছিল, তখন হিন্দু পরকে—অহিন্দুকে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিত না। যেদিন হইতে ভারতে ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, জন্মগত অথচ গুণবিরহিত ব্রাহ্মণের প্রভাবে হিন্দুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শোচনীয় ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দুর অধঃপতনের সূত্রপাত—অর্থাৎ জাতি-ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোচিত গুণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত বা অল্পবিশ্বাসী জননিচয়কে পরলোকের ভয় দেখাইয়া

নিজেদের দল পুষ্ট করিবার জন্য যেদিন হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং তাহাদিগের এই অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবিধান করিবার সামর্থ্য হিন্দুসমাজে লুপ্ত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দু পরাধীন হইয়াছে, হিন্দু আত্মহারা হইয়াছে, নিজের ভালমন্দ বুঝিবার ভার অপরের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। হিন্দুসমাজের এইরূপ অবস্থা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর শত্রু।

আমি বলিতে চাহি যে, হিন্দুর এই দাসোচিত মনোবৃত্তিকে সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। হিন্দুকে সহস্র বৎসরের সঞ্চিত কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বিংশ শতাব্দীর এই ভীষণতর জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে বিশাল হিন্দুজাতির মধ্যে এই আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে দুর্দ্দমনীয় বিরাট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাকে সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হিন্দুসভার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে—আত্মবিদ্বেষে, আত্মকলহে জর্জ্জরপ্রায় হিন্দুজাতিকে পুনঃসংগঠিত করা। এই সংগনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে, হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগত উচ্চনীচব্যবস্থার শোচনীয় পরিণতি—অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা। ব্রাহ্মণকুলে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আপনা অপেক্ষা হীন বিবেচনা করে। এই জ্ঞান যে সর্ব্বথা হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রাচীন ভারতে যতদিন হিন্দু বাঁচিয়া ছিল, ততদিন এইপ্রকার জাতিগত উচ্চনীচভাব ছিল না এবং সমাজমধ্যে তন্মূলক ঘোরতর অশান্তিও বিদ্যমান ছিল না—ইহা আমরা হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি। চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিলে, চণ্ডাল যে কূপজল গ্রহণ করে, সেইকূপে জলগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ও অন্য দ্বিজাতি অপবিত্র হইয়া

যায়—এরূপ বাক্য বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকভাগের মধ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ—

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ সবিস্তারে নির্ণয় করিতে হইবে। এইরূপ বচন আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস মহাভারত, সেই মহাভারতে প্রাচীন ভারতের কি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখুন—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং স্মৃতম্।
ব্রহ্মণা সৃষ্টপূর্ব্বং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

বেদব্যাস বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইরূপ জন্মগত বর্ণবিভাগ পূর্ব্বে ছিল না। যে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিত, সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত। যে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিত, সেই ক্ষত্রিয় হইত। যে বাণিজ্যাদি করিত, সে বৈশ্য হইত। জন্মের দ্বারা জাতি বিভাগ হয় না—কিন্তু কর্ম্মদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। সকল মানুষই ভগবানের সৃষ্ট। মানুষের যাহা লক্ষণ—হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি,—তাহা সকল মানুষেই একপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের এই জাতিগত বিভাগ যে জন্মকৃত, এ বিষয়ে প্রমাণ বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের যে বচনটীর উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীনপন্থিগণ জন্মগত ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থাপন করেন, তাহা একটী রূপক ছাড়া কিছুই নহে। সে বচনটী এই—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য বৈশ্যোঽথ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

এই বচনে সেই বিশ্বরূপধর বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ ছিল এই

কথা বলা হইয়াছে। প্রাচীনপন্থিগণ বলিয়া থাকেন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কিন্তু বচনে বলে না। বচনে বলে—মুখ ব্রাহ্মণ ছিল। ইহা রূপক ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে? মুখ হইতে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইবে—ইহাই যদি বেদের অর্থ হয়, তাহা হইলে প্রাচীনপন্থিগণকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে বালক উৎপন্ন হয় সে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইবে? কারণ, সে ত' বিরাট্‌ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইল না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাঁহার যথাক্রমে বাহু ও উরু করা হইয়াছিল, কিন্তু শূদ্র তাঁহার পাদদ্বয় হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছিল—মন্ত্রটী এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাঁহার বাহু ও উরু করা হইল। কিন্তু কে করিল—তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। যদি সেই পরমেশ্বরই করিয়া থাকেন, তাহা বলিলে বলিতে হয়, এই বাহু ও উরু-স্থানীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যিনি করিয়াছেন তিনি বিরাট পুরুষ নহেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যিনি বিদ্যমান থাকিয়া এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ মস্তক, বাহু, উরু ও পদরূপ-অবয়ব-যুক্ত বিরাট পুরুষের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই নির্ম্মাতা পুরুষই বেদান্তদর্শনানুসারে মায়োপহিত ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর মায়িক সংকল্পানুসারে এ সংসারের সকল প্রকার দৃশ্যবস্তুর নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন—ইহাই হইল বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই মন্ত্রেও সেই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট এইরূপ কোন নির্দ্দেশ এই মন্ত্রে নাই। শরীরের মধ্যে মুখ উৎকৃষ্ট, বাহু অপকৃষ্ট, উরু তদপেক্ষা অপকৃষ্ট এবং পাদ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অঙ্গ—এই প্রকার কল্পনা কবিগণেরই শোভা পায়। কারণ মুখের ন্যায় বাহু, উরু ও পাদ প্রত্যেক অঙ্গই শরীরের পক্ষে একান্ত উপযোগী—যে কোনটির অভাব হইলে শরীর বিকল ও অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। শরীর-

ধারণ ও শারীরিক কার্য্য করিতে হইলে ঐ সকল অঙ্গেরই পূর্ণতা থাকা চাই, একটীরও অভাবে পুরুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। স্ব স্ব কার্য্যবিষয়ে উহাদের প্রত্যেকেরই অসাধারণ উপযোগিতা আছে—সে হিসাবে কোন অঙ্গই কোন অঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আপেক্ষিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—এইরূপ কল্পনা কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ এই মন্ত্রটী বিধায়ক নহে, কিন্তু উহা স্তুতি। সমগ্র ধরাতল ব্যাপিয়া প্রতিষ্ঠিত বিরাট মনুষ্যসমাজরূপ বিরাট পুরুষের অসীম শক্তিমত্তার ইহা স্তুতিবাক্য ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার মুখ্য অর্থে কোন তাৎপর্য্য নাই। মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ইহাই—কারণ এই প্রকার লোকবিরুদ্ধ অর্থবোধক বৈদিক বাক্যের স্বার্থে যে তাৎপর্য্য নাই, তাহা অর্থবাদাধিকরণে মীমাংসাসূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শবরস্বামীও অতি বিশদভাবে তাহারই উপপাদন করিয়াছেন।

স প্রজাপতিরাত্মণো বপামুদখিদৎ—

সেই প্রজাপতি নিজের বক্ষঃস্থিত বপানামক মাংসল যন্ত্রবিশেষ উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন—এইরূপ বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—কেহই নিজের বপা উপ্ড়াইয়া তাহা দ্বারা হোম করিতে পারে না—সুতরাং এইরূপ বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। ইহা দ্বারা বপাহোমের স্তুতিই করা হইতেছে। সেইরূপ "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্র যজ্ঞের দেবতা বিরাট পুরুষের স্তুতি করিতেছে মাত্র। ব্রাহ্মণে মুখত্বের আরোপ, ক্ষত্রিয়ে বাহুত্বের আরোপ, বৈশ্যে উরুত্বের আরোপ, এবং শূদ্রে পাদত্বের আরোপ সেই স্তুতির আনুকূল্য করিতেছে—বাস্তব কোন সত্যের উল্লেখ করিতেছে না। শ্রুতিরই অন্যত্র আছে—

স মূৰ্দ্ধ্নো রাজানমসৃজত, স মূৰ্দ্ধন্নভিষিক্তো রাজা ভবেৎ।

অর্থাৎ তিনিই শিরোদেশ হইতে রাজা সৃজন করিয়াছিলেন, শিরোভাগে অভিষিক্ত হইয়া রাজা হয়। এই শ্রুতিবাক্যও পুরুষসূক্তের রূপকত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে—কারণ, এক্ষেত্রেও যথাশ্রুত অর্থে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইলে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ হইবে না—এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন। এই ভারতবর্ষে স্মৃতিনিবন্ধগুলি রচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যে, গুণকর্ম্মগত বর্ণবিভাগ প্রচলিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারত বচন তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে।

সংস্কার-বিরোধী প্রাচীন-পন্থিগণ মুখেই মনুস্মৃতির দোহাই দেন, কার্য্যে কিন্তু মনুর মতানুসরণ বড় কেহই করেন না। মনুর যে সকল বচন প্রতিপালন না করিলে, তাঁহাদের জাতিগত ব্রাহ্মণ্যও রসাতলে যায়, সেই সকল বচনকে তাঁহারা গত সহস্র বৎসর হইতে একপ্রকার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মনু বলিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

—অর্থাৎ যে দ্বিজাতি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে শ্রম করিয়া থাকে—সে এই জন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই বিশাল ভারতবর্ষে একটিমাত্রও দ্বিজাতি যথাবিধি উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ও বিহিত ব্রতাদির সহিত বেদাধ্যয়ন করে না—ইহা অখণ্ডনীয় ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য, সুতরাং মনুর মতানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এইরূপ একজন ব্যক্তিও এখন নাই। অথচ ব্রাহ্মণের লাভ, মান, খ্যাতি ও পূজা প্রভৃতি সুবিধা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তিই লালায়িত।

তাহার এই অন্যায্যভাবে আকাঙ্ক্ষিত লাভ, মান, খ্যাতি ও পূজার বিরুদ্ধে যে দণ্ডায়মান হইবে, দল বাঁধিয়া শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, স্বজাতি-দ্রোহী বলিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিতে ও অপদস্থ করিতে আজ সমগ্র ভারতের সকল হিন্দুসমাজের তথাকথিত ব্রাহ্মণ নেতৃবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ সমাজের শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে—তাহা কল্পনাতেও প্রতিভাত হয় না।

সংস্কারবিরোধী প্র্যচীন-পন্থিগণ নিজের বংশ-পরম্পরাপ্রাপ্ত লাভ সম্মানাদিজনক অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আজ হিন্দু ভারতের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা ভাবিলেও প্রত্যেক স্বজাতি-প্রেমিক হিন্দুর হৃদয় আতঙ্কে ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠে।

যে জাতির মধ্যে শতকরা ৮০ জন ব্যক্তি অপর ২০ জনের অস্পৃশ্য হেয়, যে জাতির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইবার ব্যবস্থা নাই, শীতবর্ষায় উপযুক্ত গাত্রাবরণের সংস্থান নাই, হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াও হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাস্য দেবপ্রতিমার পূজায় অধিকার নাই, তথাকথিত উচ্চবর্ণের বলপূর্ব্বক সংস্থাপিত ব্যবস্থার প্রভাবে সাধারণ বিদ্যামন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের অনুকূল শিক্ষালাভের সুযোগ নাই, সেই জাতির এই বর্ত্তমান যুগের অতি কঠিন জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার কল্পনা যে আকাশকুসুমকল্প তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এ সংসারে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে যে জাতি বঞ্চিত, পরকালে তাহার পক্ষে অমরাবতীর তোরণদ্বার অনন্ত কালের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়া আছে—এই বিশ্বাস লইয়া কতকগুলি প্রাচীন আচার প্রতিপালন করিতে

করিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিবার নাম যদি হিন্দুত্ব হয়, তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ভারতের নব জাগরিত হিন্দু সে হিন্দুত্বকে বিসর্জ্জন দিতে অনুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবে না। ঐহিক সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ে বঞ্চিত হইয়া আজীবন দাস-মনোবৃত্তি লইয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাই যদি হিন্দুত্বের পরিণাম হয়, তাহা হইলে সেই হিন্দুত্বকে যত শীঘ্র পারা যায়, বঙ্গোপসাগরের অতল জলে বিস-র্জ্জন করাই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অধঃপতিত, পরপদ-লাঞ্ছিত, পৃথিবীর সকল মানব সমাজে দাস বলিয়া চির-উপেক্ষিত, দুর্ব্বহ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন লইয়া এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার বিড়ম্বনাভোগ নব্যহিন্দু করিতে চাহে না।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে আমরা কাহার বংশধর! যে হিন্দু একদিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির জ্ঞানদাতা গুরু ছিল,—যে হিন্দুর মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

—এই দেশে সমুদ্ভূত ব্রাহ্মণের নিকটে পৃথিবীর সকল মানব নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে, আমরা সেই হিন্দুর বংশধর—যে হিন্দুর জ্ঞান, বীর্য্য, মহিমা ও শান্তি-লাঞ্ছিত বিজয়বৈজয়ন্তী একদিন ভারত-সাগর পার হইয়া সিংহলে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, মরীচিদ্বীপে বড় বড় বিরাট ভাস্কর্য্যমণ্ডিত দেবমন্দিরে গগনস্পর্শী স্বুবর্ণময় ধ্বজদণ্ডের উপর মৃদু মারুত হিল্লোলে খেলা করিতে করিতে বিশ্বমানব-বিজয়িনী হিন্দুসভ্যতার কীর্ত্তি গান পত পত ধ্বনিতে শত শত বৎসর ব্যাপিয়া গাহিত, যে হিন্দুর গৈরিক-সম্বল প্রতিনিধি চিরহিমানীমণ্ডিত সমুচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সুদূর তিব্বতে, মঙ্গোলিয়ায়, চীনে, কোরিয়ায় ও জাপান প্রভৃতি

দেশে কোটি কোটি নরনারীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ে সদ্ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক বিতরণপূর্ব্বক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, মনে থাকে যেন আমরা সেই হিন্দুর বংশধর। যে হিন্দু জগতের সমগ্র সভ্য জাতির গুরুস্থান অধিকার করিয়া "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং অমৃতং পুরস্তাৎ" এই মহাবাক্যের ঘোষণা দ্বারা সর্ব্বভূতে একই আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, মানবাত্মার মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্যই নাই, এই অভ্রান্ত সত্য প্রচার করিয়াছিল, সেই হিন্দুর সন্তান হইয়া, সেই হিন্দুর আবিষ্কৃত জ্ঞান বীর্য্য, প্রসাদ ও শান্তি-মণ্ডিত সভ্যতার অধিকারী হইয়া, আজ আমরা কি ঘৃণিত অবস্থায়, কিরূপ উপেক্ষিতভাবে পৃথিবীর সকল মনুষ্যজাতির মধ্যে মার্কামারা দাস হইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছি। আপনার ভাইকে শত্রু করিয়াছি, নিজের দেবমন্দিরে নিজের ভাইকে প্রবেশ করিতে দেখিলে দেবতা অপবিত্র হইবেন ভাবিয়া বৃথাভয়ে আকুল হইতেছি। যাহাদের শিক্ষা দিলে, যাহাদের দীক্ষা দিলে, যাহাদের হীনাবস্থা ঘুচাইয়া সমান করিলে, আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সকলপ্রকার মঙ্গললাভ অনিবার্য্য হইবে, তাহাদিগকে ঘৃণা করা, নীচ ভাবা, অস্পৃশ্য মনে করা—আমাদের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল দাসোচিত মনোবৃত্তি যাহারা জাতির প্রতি শোণিত বিন্দুতে মিশাইয়া দিয়াছে, তাহাদিগের কথায়, তাহাদিগের কল্পিত পরলোক-বিভীষিকার আমরা এখনও ভীত হই, ইহা অপেক্ষা মনুষ্য-জাতির পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে? হিন্দুসভা এই দাসোচিত মনোবৃত্তিকে, এই গোঁড়ামির দুর্ব্বিবহ লৌহশৃঙ্খলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে—এই দাসোচিত মনোবৃত্তির বিধ্বংসের জন্য হিন্দু সভা যে প্রযত্ন ও যে

অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সহিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন প্রকার বিরোধই নাই। হিন্দুসভা হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী নহে, কিন্তু ইহা হিন্দু-শাস্ত্রের সংস্কারসমূহের বিধ্বংস করিবার জন্যই মস্তক-উত্তোলন করিয়াছে। হিন্দুসভা বাহিরের শত্রুকে শত্রু বলিয়াই জ্ঞান করে না, সে হিন্দু সমাজের অন্তঃশত্রুর সহিত বিরোধ করিবার জন্য, তাহার উচ্ছেদ করিবার জন্য বলসঞ্চয় করিতেছে। হিন্দুসভা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী নহে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত যে বর্ণাশ্রমাভাস, তাহাকে দূর করিয়া গুণকর্ম্মগত বাস্তব বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এই ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বেদশাস্ত্র ইহার বিরোধী নহে, পরন্তু বেদশাস্ত্র ইহার অনুকূল। সেই শাস্ত্রেরই সাহায্যে হিন্দুসভা এই দুঃসাধ্য সাধন করিবে—ইহা স্থির।

গুণকর্ম্মহীন, জন্মনিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণত্ব হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্টকর, সুতরাং ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক, এই কথা নব্যপন্থিগণের মুখে শুনিয়া প্রাচীনপন্থিগণের মত এই যে—এই ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিষময় ফল ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে; উচ্চনীচজাতিনির্ব্বিশেষে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার বহুলপ্রচারের ফলে, নীচ জাতিগণ সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠাদর্শনে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তাহার ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে; তাহাদের সহিত পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত বিকৃতমস্তিষ্ক কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যের বিলোপ দ্বারা হিন্দুসমাজে এক সর্ব্বনাশকর বিপ্লবের যুগ আনয়ন করিতেছে; পিতৃপুরুষগণের অবলম্বিত সনাতন আচার-মার্গ প্রতিপালন করিতে লোভ ও আলস্যবশতঃ অসমর্থ হইয়া তাহারা হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; সুতরাং ইহারাই হিন্দু সমাজের ভয়াবহ অন্তঃশত্রু; ইহাদের উচ্ছেদ করিবার

করিবার জন্যই আজ কলিকাতা, ঢাকা, বারাণসী প্রভৃতি গোঁড়ামী প্লাবিত স্থানে দলবদ্ধ হইয়া প্রাচীনপন্থিগণ, ধর্ম্ম গেল, বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে ভারতের গগন-পবন মুখরিত করিয়া নিজের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু গুণবর্জ্জিত, মিথ্যাচারকদর্থিত, জন্মমাত্রনিয়ত ব্রাহ্মণ্য বেদসম্মত নহে, অতি প্রাচীনকালের বৈদিক সাহিত্যেই এইরূপ কথা ও এইরূপ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হয়ত আমাদের মধ্যে এখনও অনেকের জানা নাই। যাঁহারা ইহা জানেন না তাঁহাদের অবগতির জন্য বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ উপনিষদ্ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি—কো বা ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানং, কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। অতীতানাগতা-নেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাৎ অনেকদেহসম্ভবাৎ জীবস্যৈকরূপরুত্বাৎ চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। আচাণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ জরামরণধর্ম্মাধর্ম্মাদিসাম্যদর্শনাদ্। ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ, ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো, বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ, শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদিশরীর-দহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্ম হত্যাদিদোষ সম্ভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি, ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বূকো জম্বূকাৎ, বাল্মীকঃ বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াং, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ

উৰ্ব্বশ্যাং, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপি অগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতি ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থ-দর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্ম্ম সাধর্ম্ম্য-দর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতা সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কর্ব্বন্তি ইতি তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষভূতান্তর্যা-মিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতং অখণ্ডানন্দস্বভাবপ্রমেয়মনু-ভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতঃ দম্ভাহঙ্কারাদিভিরস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত এব মুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।

ইহার অর্থ এই—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটী বর্ণ; ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ইহাই বেদের অভিমত, স্মৃতিসমূহও ইহাই বলিয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতেছে ইহাই যে, এই ব্রাহ্মণ কে? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? অথবা শরীর ব্রাহ্মণ? কিংবা জাতি ব্রাহ্মণ? অথবা জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? কিংবা কর্ম্ম ব্রাহ্মণ? অথবা ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ? এই কয়টী প্রশ্নের মধ্যে প্রথমকল্প অর্থাৎ জীবাত্মাই ব্রাহ্মণ—এইরূপ কল্প হইতে পারে না। কারণ অতীত ও অনাগত অনেক দেহের সম্বন্ধী জীব সর্ব্বদা একরূপই হয়। একই জীবের কর্ম্মবশতঃ

অনেক দেহের সহিতই সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বশরীরে জীব একরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবাত্মা ব্রাহ্মণ—এইরূপ পক্ষ হইতে পারে না। তবে দেহই ব্রাহ্মণ হউক, এইরূপ পক্ষও যুক্তিসহ নহে। চাণ্ডালাদি সকল মনুষ্য-দেহই পাঞ্চভৌতিক, সুতরাং মনুষ্যমাত্রের দেহ এক প্রকার। সকল দেহের জরামরণরূপ পরিবর্ত্তন আছে। ধর্ম্মাধর্ম্মও সকল দেহের সামান্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ—এইরূপ নিয়মও না থাকায় এবং পিতা প্রভৃতির শরীর মরণের পর দাহ করিলে, পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রসক্তি বশতঃ দেহও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে জাতি বিশেষকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে—এই প্রকার মতও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও অনেক ব্যক্তিই মহর্ষি হইয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর উদরে জন্মিয়াছিলেন, কৌশিক কুশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, জাম্বূক নামে ঋষি শৃগাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বাল্মীকি বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বেদব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার উদরে জন্মিয়াছিলেন, শশের পৃষ্ঠভাগ হইতে গৌতম হইয়াছিলেন, অগস্ত্য কলসে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—ইহা শ্রুত হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ জাতি বিশেষে জন্ম পরিগ্রহ না করিয়াও উঁহাদের জ্ঞানপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব হইয়াছিল এবং এইরূপ আরও অনেক মহর্ষি হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং জাতিবিশেষই যে ব্রাহ্মণ তাহা বলা যায় না। তবে জ্ঞানই ব্রাহ্মণ হউক—তাহাও নহে। কারণ ক্ষত্রিয়াদিও, পরমার্থদর্শী ও অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সুতরাং জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহে। কর্ম্মেই তবে ব্রাহ্মণ হউক—তাহাও নহে। কারণ প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামিক—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই থাকে। সকল দেহীই কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া এ সংসারে কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ ইহাও বলা যায় না। তবে

ব্রাহ্মণ কে? ইহার উত্তর এই যে, ষট্ প্রকার ঊর্ম্মি ও ষট্প্রকার ভাববিকার যাহার নাই,—যাহা সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, যাহা সত্য, জ্ঞান, আনন্দময় ও অবিনাশী, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নির্ব্বিকল্প অথচ অশেষ কল্পের আধারভূত, যাহা অশেষ প্রাণীর অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান, সকল পদার্থের বাহিরে ও ভিতরে যাহা আকাশের ন্যায় অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দই যাহার স্বভাবভূত, যাহা অপ্রমেয়, সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে করতলস্থিত আমলকফলের ন্যায় যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াছে, যে শমদমাদিভাবসম্পন্ন, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণা, আশা ও মোহ যাহার নষ্ট হইয়াছে, দম্ভ ও অহঙ্কার দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ—শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণেতিহাসের ইহাই তাৎপর্য্য।

এই ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে আবার যাহাতে হয়, তাহারই জন্য হিন্দুসভা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে হইলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কূপমণ্ডূককল্প-গতানুগতিক, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুলকে সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যপূত, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, নির্লোভ ও অসূয়াশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। এইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায় যাহাতে সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধানে পথনির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহার জন্য যাহা বৈধ উপায় তাহার অনুষ্ঠান করিতে হিন্দু-মহাসভা আয়োজন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা হিন্দুর জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যাহাতে সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাহার জন্য বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুসভার

অনুমোদন অনুসারে একটী ব্রাহ্মণ পরিষৎও স্থাপিত হইয়াছে। মহামনা, ভারতভূষণ, শিক্ষিত-হিন্দু-সমাজের অগ্রণী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় এই ব্রাহ্মণ পরিষদের এই বৎসরের পরিচালনার জন্য দুই হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কারকামী বিশুদ্ধচরিত কতিপয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায়-কল্প বহু পণ্ডিতই এই ব্রাহ্মণ পরিষদের ব্যবস্থাপক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পক্ষপাত-রহিত, মীমাংসাসম্মত যুক্তির সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সার রহস্যরূপ রত্নরাজির উদ্ধার পূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাহার প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ পরিষৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের বাস্তব উন্নতির জন্য যে বদান্যাগ্রগণ্য, বৈশ্যকুলভূষণ শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিরলা মহোদয় অকাতরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন—তিনি এই ব্রাহ্মণ পরিষদের পৃষ্ঠপোষক বা Patron হইয়াছেন। বঙ্গীয় হিন্দুসভা এই ব্রাহ্মণ পরিষদের সমুন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি অচিরকালেই এই ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুসমাজ আবশ্যক সংস্কার কার্য্যগুলি বিহিতভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।

আমার বক্তব্য অদ্যকার জন্য শেষ হইয়া আসিল। উপসংহারে আমার আসাম দেশীয় প্রিয়ভ্রাতা ও মাতৃগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা হিন্দুর সংগঠন কার্য্যে দৃঢ়চিত্ত হউন, অস্পৃশ্যতারূপ মহাব্যাধি হিন্দুসমাজ হইতে চিরদিনের জন্য যাহাতে বিদূরিত হয় তাঁহারা ঐকমত্যসহকারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হউন। সমগ্র ভারতে হিন্দু-জাগরণের যে নূতন বিজয়বৈজয়ন্তী উত্তোলিত হইয়াছে, জাতিগত উচ্চনীচভাব পরিহারপূর্ব্বক ব্যক্তিগত আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা

ও প্রতিষ্ঠা কামনায় বিসর্জ্জন দিয়া আমরা সকলে এক ভারত-মাতার উচ্চনীচ-ভাব-বর্জ্জিত সন্তান, এই জ্ঞানে দেশমাতৃকার গৌরবরক্ষা রক্ষা করিবার জন্য তাহারই মূলে সকলে মিলিত হউন। প্রত্যেক হিন্দু-ললনা যাহাতে শিক্ষিত হয়, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তান যাহাতে শিক্ষিত, বীর্য্য-সম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে সকলেই চেষ্টা করুন, দেশের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হউক, আত্মবিবেকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হউক। অজ্ঞান—কল্পিত কলিযুগ দেশ হইতে বিদূরিত হউক, সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হউক, হিন্দুর যথার্থ হিন্দুত্ব জাগিয়া উঠুক, তাহার ফলে ভারতে—না না শুধু ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে—সর্ব্বজাতির মধ্যে, অধ্যাত্মজ্ঞান-অনাবিল শান্তি—ও বিশ্বজনীনপ্রেম দ্বারা সমলঙ্কৃত পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হউক, ইহাই আমার পতিতপাবন দীনতারণ শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভগং যথা পূর্ব্বে সজ্জনানাং উপাসতে।।১।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং সহচিত্তমেষাং
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।২।।
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহামতি।।৩।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।

পাবনা জিলা হিন্দু-সম্মেলনী

—ঃ*ঃ—

১৩৩৬

সভাপতির অভিভাষণ

সহস্রাধিকবর্ষব্যাপী নৈরাশ্যময় অবসাদের পর হিন্দুর জাতীয় জীবনে আজ জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, দীর্ঘকালীন মোহনিদ্রার পর আজ হিন্দু জাগিয়াছে, জাগিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে—সম্মুখে, পশ্চাতে ও আশে পাশে-চাহিয়া—যাহা দেখিতেছে, যাহা ভাবিতেছে, যাহা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছে—তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের সম্মুখে দিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। হিন্দু সম্মুখে দেখিতেছে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র যাহার আদি নাই, যাহার অন্তও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এই সম্মুখের সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির পরস্পরবিরোধী স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার সমবেদনার লোক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত, পরের মুখের দিকে চাহিবার অবসর কাহারো নাই, দীর্ঘকালের মোহনিদ্রায় অবসাদ-গ্রস্ত হিন্দুকে হাতে ধরিয়া উঠাইবার জন্য কেহ প্রস্তুতও নহে, প্রস্তুত হইবার অবসরও কাহারও নাই, ইচ্ছাও নাই, সকলেই অসুর-বলে বলীয়ান্‌। বিজ্ঞান-গণিত-শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবে তাহারা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু হিন্দুর শিল্পসম্ভার হস্তচ্যুত হইয়াছে,

বাণিজ্যের বিরাট বাজারে দালালী ছাড়া তাহার আর কিছু নাই বলিলেও চলে। বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে যাহা থাকা একান্ত আবশ্যক সহস্রবর্ষব্যাপী দাসোচিত মনোবৃত্তির দারুণ নিষ্পেষণে আজ তাহার তাহা কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই আত্মীয়-স্বজনবিহীন সমবেদনা-শূন্য-ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা সকলই তাহার থাকিলেও, আজ কিন্তু তাহার কোন বস্তুর উপরে স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সম্মুখক্ষেত্রের এই ভীষণ হৃন্মর্ম্মবিদারক অবস্থা দেখিয়া হিন্দু ব্যাকুলভাবে তাল সামলাইবার জন্য যখন পশ্চাতে ফিরিয়া চাহে—কি দেখে! তখন দেখে তাহার পশ্চাৎ—তাহার অতীত—কত সুন্দর, কত মনোহর! যখন সে দেখে পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির যোগ্যতম প্রতিনিধিগণ সভ্যতার মূল মন্ত্র কি, জীবনের সারসর্ব্বস্ব কি, মানবত্বের চরম উদ্দেশ্য কি, তাহাই জানিবার জন্য, তাহার সংগ্রহ করিবার জন্য, তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের জাতির ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলবিধান করিয়া মর-জগতে অমর হইবার জন্য, ভূমণ্ডলের সকল প্রদেশের সকল মানবজাতির যোগ্যতম প্রতিনিধি-বর্গ বিনীতভাবে ছাত্রের বেশ ধরিয়া তাহার দেশের মহাপুরুষগণের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে, সে বিস্ময়বিহ্বল হৃদয়ে আত্মহারা হইয়া উঠে।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান রচয়িতা ভগবান্ মনুর এই প্রাচীন ভারতের সমুজ্জল চিত্রের মধুর স্মৃতিতে তাহার হৃদয় আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়, তাহার মানসনেত্র খুলিয়া যায়। সে দেখে—হিন্দুসভ্যতার—হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার—হিন্দুর বিশ্ববিজয়িনী শক্তির বিজয়বৈজয়ন্তী

উত্তুঙ্গ হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত গগনভেদী শৃঙ্গনিচয়ে উড্ডীয়মান হইয়াই বিরত হয় নাই, সেই বিজয়বৈজয়ন্তী সহস্রধা প্রবিভক্ত হইয়া সুদূর চীন, কোরিয়া, জাপান, তাতার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা ভারতসমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অগণিত দ্বীপসমূহের মৃদুমারুতহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, পশ্চিমে হিন্দুকুশ অতিক্রমণ করিয়া পারস্য ও মিসর প্রভৃতি দূর দূরবর্ত্তী দেশে সগর্ব্বে মারুতের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। সে দেখে তাহার পশ্চাতের বা তাহার অতীতের হিন্দুগণ শারীরিকবলে, মানসিক শক্তিতে ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে অতুলনীয়। বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, চতুঃষষ্টিকলা ও বার্ত্তা প্রভৃতি শাস্ত্রে সেই প্রাচীন হিন্দুরই একাধিপত্য, অদ্বিতীয় অধিকার। সে দেখে তাহার পশ্চাতে তাহার স্মরণীয়চরিত পূর্ব্বপুরুষগণের সংঙ্ঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবনের জ্ঞান রহিয়াছে কিন্তু অহমিকা নাই, ধনের সীমা নাই, কিন্তু তাহাতে কার্পণ্যের বা বিলাসিতার কলঙ্ককালিমা দেখিতে পাওয়া যায় না, বাহুতে অসীম বল, কিন্তু সে বল কোনদিনই অসহায় ও দুর্ব্বল মানবের প্রতি অত্যাচারের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

অতীতের এই মনোহর ও বিশ্ববিস্ময়কর দৃশ্য হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া যখন উভয় পার্শ্বে সে দেখিতে আরম্ভ করে, তখন কি দেখিয়া থাকে। সে দেখে কোন দিকেই তাহার অগ্রসর হইবার পথ নাই, চীনে তিব্বতে, তাতারে, পারস্যে, আফ্‌গানিস্থানে, একটী মনুষ্যও তাহার ব্যথার ব্যথী নহে, সকলেই তাহাকে দুর্ব্বল দেখিয়া ঘৃণা করে, উপেক্ষা করে, পাছে তাহার সম্পর্কে নিজের দেশ কলুষিত হইয়া উঠে এই ভয়ে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিজ নিজ দ্বার রুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। দীর্ঘনিদ্রার পর জাগিয়া এই প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরে যে দৈন্যের, যে অসহায়তার ও যে নৈরাশ্যের অরুন্তুদ অনুভূতি

উদিত হয়—তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে, তাহার একমাত্র সাক্ষী তাহারই

এই অসহায় বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য, সম্মানের সহিত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততিবর্গের পরিবর্দ্ধনশীল সমুন্নতির জন্য প্রত্যেক হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কি কার্য্য অবিলম্বে করিতে হইবে—তাহারই ভাবনায় আজ সমগ্র ভারতের নবজাগরিত হিন্দুজাতি আকুল হইয়া উঠিয়াছে। বিপদ্ যে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ্ দূর হইবে—সে বিষয়ে নানা-মুনির নানামত, যত গোল এইখানে। অন্যান্য ছোটখাট মতভেদের আলোচনা এখানে না করাই ভাল, কিন্তু যে দুইটী বিরুদ্ধমত লইয়া আজ ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে—তাহার উল্লেখ না করিলে চলে না। তাই প্রথমে সেই দুইটী মতেরই একটুকু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

হিন্দুসমাজ সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে কি নব্যপন্থী কি প্রাচীনপন্থী কাহারো মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও সনাতন ধর্ম্ম যে কি তাহা লইয়া কিন্তু দুইটী মত দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীনপন্থিগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তারস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন —বিজ্ঞানেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত স্মৃতিনিবন্ধকারগণ নিজ নিজ নিবন্ধগ্রন্থে শ্রুতি ও পুরাণের তাৎপর্য্য বর্ণন দ্বারা যে সকল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তাহা সকল হিন্দুরই সনাতনধর্ম্ম, সেই সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও আছে এবং চিরকালই এইরূপ থাকিবে। তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, পরিবর্ত্তন বা

পরিবর্জ্জনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহাদের মতানুসারে চলিলে হিন্দুসমাজ থাকিবে না, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারকগণ এই জাজ্জ্বল্যমান অখণ্ডনীয় সত্যকে উপেক্ষা করিয়া দেশে কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিতেছেন, এই কালাপাহাড়ের দলকে ছাঁটিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বাহির করিতে হইবে, ইহাদের ছায়াস্পর্শ করিলেও পাতিত্য হয়, সুতরাং ইহাদিগকে যে কোন উপায়ে দমন করিতে না পারিলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য, দমন করিবার উপায় হইতেছে ভারতে আবার ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বাহুল্য, সন্ধ্যা-পূজা ব্রত-নিয়মও পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত সদাচারসমূহের পুনঃ সংস্থাপন, বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে ত্রৈবর্ণিক হিন্দুসন্তানের গমননিবারণ, বিধবাবিবাহ যাহাতে হিন্দু সমাজে না হয় তাহার জন্য প্রাণাতিপাতিনী চেষ্টা, অন্ত্যজ ও তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির সহিত একত্র উপবেশন, এক কূপের জল ব্যবহার, দেবায়তনে তাহাদের সহিত একস্থানে থাকিয়া দেবদর্শন প্রভৃতি ব্যবহারের সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন এবং হিন্দুসমাজ হইতে যাহারা বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে এমন খৃষ্টিয়ান্, মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রভৃতিকে বিশুদ্ধ করিয়া আবার হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশে বাধাপ্রদান—এই সকল উপায় ব্যতিরেকে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হইবে না ইত্যাদি। অন্যদিকে নব্যপন্থিগণ বলিতেছেন যে প্রাচীন-পন্থীদিগের এইরূপ মত মানিয়া চলিলে, হিন্দুর অস্তিত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হইবে, প্রাচীনপন্থীর মতে হাজার বৎসর চলিয়া হিন্দু আজ সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়াছে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জাতিগত হওয়ায় সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের অধিকার মর্য্যাদা ও গৌরব ভোগ করিবার ফলে

আজ প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, রঘুনন্দনের মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের দেশে একজনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাই, আছে কেবল কয়েক লক্ষ ব্রাহ্মণ আর কোটি কোটি শূদ্র, অর্থাৎ হিন্দুর সমাজশরীরের মস্তক ও পাদমাত্র বিদ্যমান। সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরাট চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের দোহাইও দিতেছেন, আবার তাঁহারই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, অথচ আপনাদিগকে পিতৃপিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষসেবিত সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক বলিয়াও রীতিমত বড়াই করিতেছেন! প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহারই নাম ভণ্ডামী, ইহাকে নিরেট গোঁড়ামী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে!

ইহার উপরে যদি কোন প্রাচীনপন্থী বলেন—কাজ কি আমার ক্ষত্রিয়ে বা কাজ কি আমার বৈশ্যে! এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অর্থাৎ সেব্য ও সেবক এই দুইটী বর্ণের সমাবেশ যদি থাকে তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে ইহা ছিল, তখন যদি হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ না পাইয়া থাকে তাহা হইলে এখনই বা তাহার লোপ হইবে কেন!—ইহার উত্তরে নব্য-পন্থিগণ বলেন—বেশ কথা, তাহাই যদি তোমার কলিযুগের সনাতন-ধর্ম্মের অভিলষণীয় অবস্থা হয়, তবে তাহাই সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়া যাও না কেন! দেশে বাণিজ্য বন্ধ কর, কারণ বৈশ্য নাই, বাণিজ্য করিবার অধিকার অন্য কাহার থাকিতে পারে? বাণিজ্য চুলায় যাক্, পীড়িত দুর্ব্বলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে নিজ শক্তির

দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ ইহাত' ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, এ ভারতে যখন এ যুগে একজনও ক্ষত্রিয় নাই এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পালন যখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পক্ষে বিধেয় নহে, তখন এই ভারত হইতে বর্ত্তমান যুগে ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, ক্ষত্রিয়ের দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার—ও নির্য্যাতননিবারিণী শক্তিরও কোন আবশ্যকতা নাই। শুধু কি তাই, কৃষি ও গোরক্ষাই বা কিরূপে হইতে পারে, এ সব ত বৈশ্যের কার্য্য, বৈশ্যই যখন নাই তখন এই সকল কার্য্য কে করিবে? ব্রাহ্মণ যদি এ কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহার স্ববৃত্তিত্যাগপূর্ব্বক নীচ বর্ণের বৃত্তিগ্রহণজনিত প্রত্যবায় হইবে, ইহাই ত সনাতনী ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণের পক্ষে যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিতে দুইবেলা দুই মুঠা গ্রাসের সংস্থান সম্ভবপর, সে পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ সনাতন-ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং প্রকৃত সনাতনী হিন্দু হইয়া এই লোকে কোনরূপে শেষ পর্য্যন্ত দিন কয়টা কাটাইয়া, পরলোকে অপার সুখলাভের অধিকারটা বজায় রাখিতে হইলে কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে।

বাকী রহিল শূদ্র, তাহাদের স্বধর্ম্ম হইল দ্বিজাতিশুশ্রূষা, এবং দ্বিজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে দাসোচিত দেহের পবিত্রতা রক্ষা, তাহা যতক্ষণ সম্ভবপর ততক্ষণ সে যদি তাহা না করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ত তাহার পরলোকে নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। সে যদি নরকপাতের ভয়ের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, ঐ সকল উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করে—তাহা হইলেই সনাতনী ব্যবস্থা অতল জলে ডুবিবে, হিন্দুত্বের লোপ হইবে, ইহাই ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত। এই মত যিনি না মানিবেন, ইঁহার বিরুদ্ধে যিনি

আন্দোলন করিবেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মের শত্রু, তিনিই বর্ত্তমান যুগের কালাপাহাড়. ইহাই হইল বাঙ্গলার ব্রাহ্মণপণ্ডিতনামে প্রথিত সমাজ নেতৃবর্গের সিদ্ধান্ত, ইহাই হইল সনাতনী শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা! এই ব্যবস্থা দেশের কয়টা লোক মানিয়া চলিতেছে, বা মানিয়া চলিলে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ কয়দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন।

এই প্রকার পরস্পরবিরোধী মতদ্বয়ের মাঝখানে পড়িয়া বাঙ্গলার বিরাট হিন্দুসমাজ কর্ত্তব্যনির্ণয়ের অভাববশতঃ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে বিবদমান প্রাচীন-পন্থীও নব্যপন্থীর পরস্পর গালি, দোষানুসন্ধিৎসা ও ঈর্ষ্যাপ্রসূত কলহের বিকট কোলাহলে বাঙ্গলার আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পিতা পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, শ্বশুর জামাইয়ে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে, কুটুম্বে কুটুম্বে, ভীষণ মনোমালিন্য সৃষ্ট হইয়া সমাজের সকল শৃঙ্খলাকে নষ্ট করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। এই স্বজনবিরোধসমুদ্ভূত তীব্র হলাহলের করাল গ্রাস হইতে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, আবার প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুজাতির নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য, বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মহাসভা সংস্থাপিত হইয়্যছে, ইহাই আপনাদের নিকট আমার অদ্যকার প্রধান বক্তব্য। হিন্দু-সভার পরিচালকবর্গের মধ্যে কাহারো মনে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন দ্বারা বাঙ্গালীকে এক নূতন কিম্ভূত-কিমাকার জাতিতে পরিণত করিবার কোন প্রকার অভিলাষ নাই—ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে মুক্ত কণ্ঠে আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি; এই বিশাল সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর ক্রোড়ে বাঙ্গালী হিন্দু যথার্থ হিন্দু হইয়া যাহাতে এই দেশে হিন্দুগৌরব, হিন্দুসভ্যতা, হিন্দু আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুমহিমা

সংস্থাপিত করিয়া ঐহিকও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলের অধিকার লাভপূর্ব্বক মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করিতে পারে—তাহারই জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা আজ কার্য্যক্ষেত্রে ধৈর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হিন্দু-মহাসভা হিন্দুসমাজকে নবজীবন প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তির সঞ্চার করিবার জন্য যে পন্থা ও প্রণালীর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত এবং মহর্ষিগণের অনুমোদিত, বর্ত্তমান সময়ে সেই পথা ও প্রণালী ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পথ বা প্রণালী যে শাস্ত্রসম্মত নহে এবং মহর্ষিগণেরও অনুমোদিত নহে—তাহাই হিন্দুসভার দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অনুসারেই হিন্দু-মহাসভা কার্য্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও দৃঢ়তা ও অধাবসায়ের সহিত করিবে। হিন্দু-মহাসভা হিন্দুর সর্ব্বতোমুখী জাতীয় উন্নতির জন্য প্রধানভাবে চারিটী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা আপনাদের কাহারো বোধ হয় অবিদিত নহে; সেই চারিটী কার্য্য হইতেছে—শুদ্ধি, সংগঠন, অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও বালবিধবা-বিবাহ।

বর্ত্তমান সময়ে এই চারিটী কার্য্য না করিলে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব যে অচিরকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে—ইহাই হইল হিন্দুসভার দৃঢ় বিশ্বাস। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এই কয়টী অত্যাবশ্যক কার্য্যের অনুমোদন করিয়া থাকে, ইহাই আমি ময়মনসিংহ-অভিভাষণে জানাইয়াছি। আমার এই সিদ্ধান্তের কেহই এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত যে কয়জন প্রাচীনপন্থী খণ্ডন করিবার প্রয়াসে সংবাদপত্রে বা সভাতে বাগ্‌জালবিস্তার করিয়া নিজদলের মধ্যে প্রশংসালাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বক্তৃতার ও প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই শিষ্টবিগর্হিত অকথ্য ভাষায়, গালাগালিতে কলঙ্কিত, তাঁহাদের সকল যুক্তিই অন্তঃসার-

শূন্য, তাহাতে তাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্ররহস্যবোধে শোচনীয় অসামর্থ্যের পরিচয় প্রতিপদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ অথচ ব্যবহারজ্ঞ মনীষী ব্যক্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া বিচার দ্বারা নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ, প্রাচীনতা ও গতানুগতিকতার দোহাই ছাড়া তাঁহাদের বক্তৃতা বা প্রবন্ধে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিতে যেমন মজবুত, শাস্ত্র বুঝিতে কিন্তু তেমনই অপারগ, সুনিয়ন্ত্রিত সভ্যমণ্ডিত বিচারসভায় উভয়পক্ষসম্মানিত অন্ততঃ তিনজন মধ্যস্থের সাহায্যে তাঁহারা যদি নিজমতের প্রামাণিকতা ব্যবস্থাপিত করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে হিন্দুসভা এই চারিটী কার্য্যের অবৈধতা মানিয়া লইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিবে না। আর এইরূপ পথ অবলম্বন না করিয়া তাঁহারা যদি দলাদলি ও গালাগালিরূপ চিরাভ্যস্ত উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা মনে রাখিবেন, হিন্দুসভার ক্রমশঃ বিস্তারশীল মঙ্গলশঙ্খধ্বনিতে, অত্যুদার হিমাদ্রি-শৃঙ্গোপম দুর্গম হিন্দুশাস্ত্রসমূহ হইতে যে বিমলবোধরূপিণী মন্দাকিনীর অপ্রতিহতগতি পুণ্যধারা ভারতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দিগ্‌দিগন্তব্যাপী বন্যাপ্লাবনে হিন্দুর জাতীয় জীবনের প্রবল অন্তরায় স্বরূপ যত অন্ধ বিশ্বাস, যত কুসংস্কার, যত শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা, যত একদেশদর্শিতা, যত আজগুবী গোঁড়ামীরূপ মত্ত ঐরাবত এখনও মাথা তুলিয়া দল বাঁধিয়া সগর্ব্বে গতিরোধের জন্য পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অচিরকালের মধ্যে তাহারা সব শব হইয়া ভাসিতে আসিতে অনন্তবিস্মৃতিময় মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবে; সেই পুণ্যপ্রবাহপূত ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে সকল মহাবীজ অঙ্কুরিত হইবে, তাহার অমৃতফলসম্ভারে ভারতলক্ষ্মীর শূন্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ

হইবে; হিন্দুর অন্নকষ্ট, বস্ত্রাভাব, অবসাদ, অনৈক্য ও আত্মকলহ আবার আকাশকুসুমে পরিণত হইবে।

কলিযুগ আসিয়াছে বলিয়া ভয় পাইলে চালিবে না, যে সকল শাস্ত্রীয় বচনের প্রামাণ্যের উপর একদেশদর্শিতাবশতঃ ঐকান্তিক নির্ভর করিয়া আজ হিন্দু আপনাকে দুর্ব্বল, অসহায় ও নিরুপায় ভাবিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে—সেই কলিযুগকে তাড়াইয়া সত্য যুগের সদ্যঃ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধ মন্ত্র শাস্ত্রই বলিয়া দিয়াছে, ইহা কেন হিন্দু দেখিবে না? কেনই বা হিন্দু তাহা দেখিয়া তদনুসারে চলিবে না? শাস্ত্র বলিতেছে—

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীমদ্ ভাগবত—১২।৩।৫২।

সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যে সকল পুরুষার্থলাভ হয়—কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহার লাভ হইয়া থাকে।

এই শাস্ত্রবচনের উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এস হিন্দু! জাতির অভিমান, কুলের অভিমান, পবিত্রতার অভিমান দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া ভারতব্যাপী বিরাট সংকীর্ত্তনমহাযজ্ঞ আরম্ভ করি, সেই পুণ্য মহামিলনে অন্তরের শুষ্কতা গলিয়া যাক্, বিশ্বজনীন প্রেমের পুণ্যপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করুক। যে এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবে, যেই আমার পতিতপাবন দয়াল ঠাকুরেব নামকে অকপট চিত্তে সারধর্ম্ম ভাবিয়া আশ্রয় করিবে, সেই আমার ভাই, সেই প্রকৃত হিন্দু, তাহার ম্লেচ্ছত্ব, যবনত্ব ও অস্পৃশ্যত্ব বিধ্বস্ত হইবে, মহামিলনের এমন মহামন্ত্র যাহাদের অনায়াসলভ্য, যাহাদের আজন্মসিদ্ধ অধিকার, তাহারা—সেই হিন্দুরা—এখনও যে আত্মকলহে, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও অভিমানের

অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইতে বসিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এ সংসারে আর কি হইতে পারে!

মানবদেহ জীবরূপে আবির্ভূত পরমাত্মার লীলানিকেতন, এই হরিমন্দিররূপ মানবদেহকে অপবিত্র করিয়া থাকে—শারীরিক ও মানসিক অশুচিতা। জ্ঞান ও ভক্তি মানসিক মলকে দূর করে এবং বাহ্যশৌচ শারীরিক মলকে দূর করে, কোন মানবই এই দ্বিবিধ শৌচবিরহিত হইলে স্পর্শযোগ্য নহে, ইহাই হইল হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। নিকৃষ্ট আচার যে ছাড়িয়াছে, ভগবদ্‌ভক্তির উদয়ে যাহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, সে যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে স্পৃশ্য, সে পবিত্র—ইহাই হইল শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্ত, কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছে—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥"

"যাহার নাম শ্রবণ, যাহার নাম কীর্ত্তন, যাহার প্রতি প্রণাম এবং যাহার স্মরণ কোন সময়ে করিলে চণ্ডালও এই জন্মেই যজ্ঞকর্ম্ম করিবার অধিকার লাভ করে, হে ভগবন্! সেই তোমাকে যে একবার দেখিয়াছে, তাহার যে এইরূপ যাগাধিকারিতা হইয়া থাকে—এই বিষয়ে অধিক বলিবার আর কি আছে? এই শ্লোকের তাৎপর্য্যবর্ণন প্রসঙ্গে আচার্য্য গোস্বামী স্বয়ং কি বলিয়াছেন তাহাও শুনুন—

"ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দৌর্জাতিত্বাভাবেঽপি সবন-যোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময়সাবিত্রজন্ম সাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবনযোগ্যত্বপ্রতিকুলদুর্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব। কিন্তু অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি, ব্রাহ্মণকুমারাণাং

সবনযোগ্যত্বাভাবব্যবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্যজন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।”

ইহার তাৎপর্য্য—জাতিব্রাহ্মণকুলে যে বালক জন্মিয়াছে, তাহার দুর্জাতিত্ব না থাকিলেও যাগাদি করিবার যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য সাবিত্র্যজন্ম অর্থাৎ গায়ত্রীদীক্ষার আবশ্যকতা আছে। এই কারণে—অদীক্ষিত চাণ্ডালাদিজাতির হরিনামকীর্ত্তনাদিদ্বারা দুর্জাতির আরম্ভক প্রারব্ধকর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইলেও, দীক্ষারূপ সাবিত্র্যজন্ম যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শিষ্টাচারানুসারে তাহার সবনযোগ্যত্ব অর্থাৎ দ্বিজাতির ন্যায় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না। যেমন ব্রাহ্মণকুমারগণের ব্রাহ্মণকুলে জন্মবশতঃ দুর্জাতিত্ব না থাকিলেও যাগাদিকর্ম্মে অধিকারলাভের জন্য সাবিত্র্যজন্ম অর্থাৎ গায়ত্রীদীক্ষা অপেক্ষিত হয়, প্রকৃতস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবন্নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা চণ্ডাল প্রভৃতির নিকৃষ্টজাতিত্ব ঘুচিয়া যাওয়ার পর যাগাদিকর্ম্মে অধিকার লাভের জন্য দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে।

মহাভারতে সাক্ষাৎ মহর্ষি বেদব্যাসও ইহাই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥

মঃ ভাঃ অনুশাঃ পঃ ১৪৩।৪৬।

হে দেবি! এই সকল কর্ম্মের ফলে হীনজাতিকুলোদ্ভব শূদ্রও সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্বলাভ করে এবং আগমসম্পন্ন হয়।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

—হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগরবচন।

যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষে কাঁসা সুবর্ণ হইয়া যায়, তেমনি দীক্ষাবিধানে মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রতা লাভ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে দ্বিজত্ব শব্দের অর্থ যে বিপ্রত্ব তাহা দিগ্‌দর্শনী নামক টীকাতে স্বয়ং শ্রীসনাতন গোস্বামীই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এই সকল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আমি ময়মনসিংহ—অভিভাষণে ও সর্ব্বজাতিসম্মেলনের অভিভাষণে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে সংক্ষেপে তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা গেল। এই সকল সিদ্ধান্ত হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত, এবং শিষ্টসম্প্রদায়-পরিগৃহীত। এই সকল সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় হিন্দুসভা শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতাপরিহার দ্বারা নবজাগরিত হিন্দুজাতির দেশ, কাল ও অবস্থার অনুকূলভাবে পুনর্গঠন করিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্থির যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই এই অত্যাবশ্যক শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা পরিহাররূপ কার্য্য করিতেছে এবং অগ্রে আরও বিস্তৃতভাবে করিবে। এই সকল কার্য্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে যুগোচিত সনাতনধর্ম্মের প্রচারে ও সংস্থাপনে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাই হিন্দু-মহাসভার দৃঢ়বিশ্বাস। বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মত—ইহা পুণ্যচরিত দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই শাস্ত্রানুকূল বিচারসাহায্যে সেই ব্যবস্থার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কেবল কূটতর্কজড়িত বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার দ্বারা শাস্ত্ররহস্যানভিজ্ঞ জন কয়েক পণ্ডিতম্মন্যব্যক্তি নিজদলের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন মাত্র। কিন্তু নবজাগরিত হিন্দুসমাজে এই প্রকার বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে ভাবে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে—

তাহা দেখিয়া মনে হয় এই সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ঐ রূপ চীৎকার অচিরকালের মধ্যে অরণ্যে রোদনরূপে পরিণত হইবে।

হিন্দুসংগঠন--ব্যতিরেকে হিন্দুর পক্ষে এই ভয়াবহ সময়ে সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ যে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিবে—ইহা এখনও যে না বুঝে বা বুঝিয়াও গোঁড়ামীবশতঃ তাহাতে বাধাপ্রদান করিতে অগ্রসর হয়, তাহার ন্যায় জাতিদ্রোহীর প্রতি সমগ্র হিন্দুজাতির কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন। সে বিষয়ে অধিক বলিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

হিন্দুসংগঠন বলিলে আমরা কি বুঝি—এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। হিন্দুসংগঠনের মূল ভিত্তি হইতেছে বহুশতাব্দীব্যাপিনী হিন্দুর দাসোচিত মনোবৃত্তির বিসর্জ্জন। আমরা কলিযুগের মানব, সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদের শক্তি নাই, জ্ঞান নাই, বীর্য্য নাই, তেজ নাই, পাপের পঙ্কে আমরা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কিসে হয় তাহা আমাদের স্বাধীন মনোবৃত্তির সাহায্যে বুঝিবার শক্তি নাই, ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষিগণ আমাদের বর্ত্তমান যুগে যাবৎ কর্ত্তব্য দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাদের নিজের স্বতন্ত্রভাবে ভাবিবার বা ভাবিয়া স্থির করিবার কিছু নাই, আবার সেই ঋষিগণের বচন সমূহের তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেরই একমাত্র নির্ব্বিসংবাদিত পৈত্রিক সম্পত্তি, তাঁহাদের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে যাহাই শাস্ত্রের অর্থ বলিয়া নির্গলিত হইবে, তাহাই শ্রুতির সার, স্মৃতির রহস্য, পুরাণের নিগূঢ় মর্ম্ম, ইত্যাদি প্রকারের যে মনোবৃত্তি ইহারই নাম দাসোচিত মনোবৃত্তি বা **slave mentality**। এই জাতীয় মনোবৃত্তিই হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ এবং ইহাই হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের প্রধান অন্তরায়।

এই প্রকার মনোবৃত্তির উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, আমরা কিছুতেই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সভ্য মানবজাতির সহিত প্রতি-যোগিতায়, এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে, আত্মরক্ষা করিতে পারিব না—এখন এই কথা প্রত্যেক হিন্দু নরনারীকে বুঝাইতে হইবে। আমরা যে অতীত যুগে সকল মানবজাতি হইতে জ্ঞানে, বীর্য্যে, পরাক্রমে, সাহসে ও পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ ছিলাম, ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি আবার এই যুগে, এই তথাকথিত কলিযুগেই আমরা সকল মানবজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার যে শক্তি ধারণ করিতেছি, সেই শক্তির প্রতিবন্ধক এই দাসোচিত মনোবৃত্তির পরিহার করিতে পারিলেই, আমরা অচিরকাল মধ্যে আবার সত্যযুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারিব, আবার পৃথিবীর সভ্য-জাতিনিবহের মধ্যে বরণীয় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভারতীয় জ্ঞানের, ভারতীয় বীর্য্যের, ভারতীয় মহিমার প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত মানব-জাতির শান্তি, প্রসাদ ও মৈত্রীর সংস্থাপন দ্বারা ভারতে মানবজন্মলাভের সাফল্যলাভ করিতে পারিব। এইরূপ আত্মনির্ভর, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে জাগাইতে হইবে। ভারতের বর্ত্তমান যুগের অসাধারণ মনস্বী, একাধারে মহাকর্ম্মী, মহাজ্ঞানী, মহাভক্ত ও মহাসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন তাহাই স্মরণ করাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন—

"Our ancestors did most wonderful works—we look back upon their works with veneration and with pride, but we also are going to work, and let others look with blessings and with pride upon us as their ancestors. With the blessing of the Lord every one here will do such deeds that will eclipse those of our ancestors yet, great and glorious as they may have been.

পুণ্যশ্লোক বিবেকানন্দের এই যুগপরিবর্ত্তনকারী মহামন্ত্রের সাধনায় দীক্ষিত হইবার পুণ্যমুহূর্ত্ত আজি ভারতে উপস্থিত হইয়াছে, এই মন্ত্রের সাধনাই আমাদিগকে গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিতেছে, হিন্দু সংগঠনের ইহাই দৃঢ় ভিত্তি হইবে, এই কথাই—এই প্রাণের কথাই আপনাদিগকে বলিবার জন্য নবজাগরিত ভারতীয় ব্রাহ্মণ-কুলের প্রতিনিধি হইয়া আজ এই অকিঞ্চন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাদের সম্মুখে দীনভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার এই আগমন তবে সার্থক হইবে, বারাণসী ত্যাগপূর্ব্বক দূরযাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, যদি আপনারা আজি হইতে এই মন্ত্রের সাধনায় দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক একবাক্যে সকলে বলেন—বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী স্বামী বিবেকানন্দের এই মহামন্ত্রের সাধনায় সমগ্র হিন্দুজাতির আত্মোদ্ধারার্থ আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিতেছে।

এই মহাভিত্তির উপর অকম্পিতপদে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে করিতে হইবে—গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে জাতীয়ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, গার্গীর ন্যায় ললনাকুলললামভূত-নারীগণের পুণ্যপাদধূলিনিবহে পুণ্যতম এই ভারতে প্রত্যেক নারীই শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে, সাহসে বিজ্ঞানে, ও আধ্যাত্মিকতাসম্পদে সমগ্র পৃথিবীতে মাতৃত্বের, ভগিনীত্বের, দুহিতৃত্বের ও সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় মনুষ্যত্বের সমুজ্জ্বল আদর্শ সৃষ্টি করিয়া এই পাপতাপ-বৈমনস্য-বিষাদগ্রস্ত সংসারকে নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারেন, তাহারই জন্য আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে কঠোর উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদিগের শিশুগণকে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে শিক্ষা দিতেছি, তাহার দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগের পাশ্চাত্যভাবপ্রবণতা,

সনাতনধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্যতা এবং দাসোচিত মনোবৃত্তির পরিপুষ্টি হইতেছে। এ জাতীয় শিক্ষার দ্বারা হিন্দুর জাতীয়ভাব গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে জাতীয় ধর্ম্মমূলক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বালকগণের মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যাহাতে সদাচার, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বদেশ-প্রেমিকতা বর্দ্ধিত হয়, দৃঢ়মূল হয়, এবং বৈদেশিক সভ্যতার আপাতমধুর ভাবনিচয়ের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যায়, তাহাও করিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্গে দৈহিকবলের সমাবেশব্যতিরেকে স্বরাজলাভের কোন উপায় আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে আমাদিগের বালকগণের জন্য ব্যায়ামশালা স্থাপিত করিতে হইবে। লাঠি, ছুরি ও তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রনিচয়ের কৌশলপূর্ণ চালনার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। শুধু বালকগণ নহে—আমাদিগের বালিকাগণও যাহাতে এই সকল শিক্ষা পায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বালকবালিকা, যুবকযুবতী, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ও তথাকথিত নীচজাতির সমর্থ ব্যক্তিমাত্রকে দেবমন্দির বা ভজনমন্দিরে সমবেত হইতে হইবে। তথায় বিশুদ্ধভাবে দেহমনকে সংস্কৃত করিয়া সকলে মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের নাম-লীলা-ও গুণমহিমার কীর্ত্তন করিতে হইবে। গ্রামের, নগরের, জনপদের প্রত্যেক সাধারণ জলাশয়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই জলগ্রহণ করিবার অধিকার দিতে হইবে। সাধারণ দেবমন্দিরে হিন্দুমাত্রেই প্রবেশ করিয়া যাহাতে দেবদর্শনের সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা অচিরেই করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যের নামই—হিন্দুসংগঠন। কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত যত শীঘ্র অনুষ্ঠিত হইবে, আমাদিগের স্বরাজ ততই নিকটবর্ত্তী হইবে, একথা যেন সকল

হিন্দুর মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন ঋষিগণের মতানুসারে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে পুণ্যতম—শুধু পৃথিবী কেন স্বর্গাপেক্ষাও দেবতাগণ এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক হইয়া থাকেন, এ কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মব্যতিরেকে কোন সাধনাই ফলদায়িনী হয় না, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এ দেশের স্বরাজসাধনার প্রয়াস কথনও সফল হইতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলিয়াছেন শুনুন—

"In another race political power is its vitality, as in England, artistic life in another, and so on. In India religious life forms the centre, the keynote of the whole music of national life, and if any nation attempts to throw off its natural vitality, the direction which has become its own through transmission of centuries, the nation dies—if it succeeds in the attempt. And, therefore, if you succeed in the attempt to throw off your religion and take up either politics or society or any other thing as your centre, as the vitality of your national life, the result will be that you will become extinct. To prevent this you must make all and eveything work through that vitality of your religion. Let all your nerves sing their chords through the back-bone of your religion."

নব্যভারতে নবজাগরিত হিন্দুর সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নবজীবনের উদ্-ভাবয়িতা স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, হিন্দুসভা এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে সনাতনধর্ম্মের আবর্জ্জনা ও অসংখ্য দাসোচিতমনোবৃত্তিমূলক কুসংস্কারের ধ্বংস করিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য

কার্য্যক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র হিন্দুভারতের সনাতনধর্ম্মমূলক একতার সংস্থাপনই হইল—হিন্দুসভার মহান্ উদ্দেশ্য, কোন জাতির প্রতি, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোনও কার্য্য করিতে হিন্দুসভা অগ্রসর হয় নাই, হইবেও না। সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই হিন্দুসভার মূল উদ্দেশ্য, ইহাই বলিবার জন্য আমি নিখিলবঙ্গ হিন্দুসভার প্রতিনিধিরূপে আপনাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। সেই সনাতনধর্ম্ম কি তাহা মহাভারতরচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের ভাষাতেই শ্রবণ করুন—

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জবম্।
জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

এই সনাতনধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, এই সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী যে আচার, যে অনুষ্ঠান, তাহা যদিও আমাদিগের দেশে বহুশতাব্দী হইতে প্রচলিত হইয়া থাকে, দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা অনুসারে সুবিধা বুঝিয়া আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যদিও তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই হইতেছে যে—সেই সকল সনাতনধর্ম্মবিরোধী আচারও কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হইবে—ইহাই হইল হিন্দুসভার সর্ব্বসাধারণ ঘোষণাবাণী।

আশা করি, হিন্দুসভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি নিজ সামর্থ্যানুসারে যতটুকু পরিচয় দিতে পারিলাম তাহাতে ইহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইয়া এই হিন্দুসভা যাহাতে স্বকার্য্যসাধনে অচিরকালমধ্যে সমর্থ হইতে পারে, তাহার জন্য ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে ও ইহাকে আত্মীয় ভাবিতে আপনারা বিমুখ হইবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর কর্ত্তব্য

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-সূর্য্য অচিরকালের মধ্যে পূর্ণজ্যোতিতে সমগ্র ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া আবার ভারতে উদিত হইবে, অবসাদের, মালিন্যের ও সশঙ্কভাবের মোহময়ী তামসী অমানিশা দূর হইয়াছে, আশার মন্দ মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, দীর্ঘকালীন নিদ্রাভঙ্গের পর আলস্য ও অবসাদজড়িত অচির-উন্মীলিত নেত্রে উষার স্নিগ্ধ-শান্ত ও সমুজ্জল আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে—সত্য, সনাতন ও ত্রিভুবনজয়ী শ্রৌত ধর্ম্মের আবাহন গীতির ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসু—সত্যপ্রতিষ্ঠ ও সত্যের জন্য জীবনোৎসর্গে প্রবৃত্ত নির্ভীক ধর্ম্মনেতৃবর্গের কোকিলকল-কাকলীমধুর—সত্য-ঘোষণাবাণী-নিচয়—ভারতের আকাশপবন মুখরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর এই জাতীয় জাগরণের মঙ্গল মুহূর্ত্তে আবার তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য—আবার তাহাকে অন্ধকার গুহায় কি করাইবার জন্য, এখনও জনকয়েক বিশেষভাবে উদ্যম করিতেছেন। যাহারা জাগিয়া—আলোকে গন্তব্যপথ দেখিয়া—অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদিগকে পরলোকে রৌরব নরকপাতের ভয় দেখাইয়া, আবার পশ্চাতে ফিরাইবার জন্য তীব্র কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত করিয়া, স্বদেশের, স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির আদ্য শ্রাদ্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীর বা তাঁহাদের মানসিক বৃত্তি

নিচয়ের সমালোচনা করিবার জন্য আমি অদ্য আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। আমি আসিয়াছি—এই জাতীয় জাগরণের দিনে—সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উরর দাঁড়াইয়া ভুবনমোহন-বিশ্ববিজয়ী সনাতন ধর্ম্ম স্বরূপ শ্রীভগবান্ বাসুদেবের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত যে পাঞ্চজন্যের নিনাদ—যাহা নবজাগরিত হিন্দুর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আজ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই আপনাদিগকে শুনাইবার জন্য।

দেহাত্মাভিমানের অবসাদে—কল্পিতভয়ের ব্যাকুলতায় ও ভাবি-শোকের বিহ্বলতায় ব্যাকুল হইয়া, অর্জ্জুন যখন কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অপারগ হইয়াছিলেন, পরধর্ম্মগ্রহণ ও স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ও নিজের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীবাসুদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম অভ্যুত্থান করে, হে অর্জ্জুন! তখনই অবতার গ্রহণ করিয়া থাকি।

সমগ্রভারতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রাচীনপন্থীরাও এই ধর্ম্মগ্লানি-নিবারণের জন্য সভা-সমিতি আহ্বানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া উচ্চকণ্ঠে কর্ত্তব্য ঘোষণা করিয়া থাকেন, নব্যপন্থীরাও এ কথা স্বীকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হন না। ভারতে সনাতনধর্ম্ম যদি মলিন না হইত, নামে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ যদি যথার্থই যাহা সনাতন ধর্ম্ম, তাহারই অনুষ্ঠান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিতেন, তাহা হইলে আজ হিন্দুসমাজের এ দুর্দ্দশা

কেন হইবে? এই দাসমনোবৃত্তির মোহময় অবসাদে তাহার কার্য্য করিবার সকল শক্তি কেন বিলুপ্ত হইবে?

শাস্ত্রে বলিতেছে—

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ স ধর্ম্মঃ।

অর্থাৎ তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, যাহার অনুষ্ঠান করিলে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল ও শেষে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়।

ঋষিগণ বলিয়াছেন—ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইতে কাম হয়, ধর্ম্ম হইতে অর্থ হয়, ধর্ম্ম হইতে অপবর্গ হয়। সুতরাং এক ধর্ম্মই হইতেছে মানবের চতুর্বর্গ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

যে জাতির মধ্যে প্রায় শতকরা আশী জন লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় না, যে জাতির মধ্যে কুড়িজন লোক আপনাকে পবিত্র ভাবে ও আশীজন লোককে অস্পৃশ্য—অনাচরণীয় বলিয়া জানে, শুধু তাহাই নয়, গৃহপালিত কুকুর বিড়াল হইতেও অধম বলিয়া বিবেচনা করে, স্পর্শ করিলে স্নান করিবার বিধান দেয়, প্রাতঃ-কালে উঠিয়া তাহাদের মুখ দেখিলে না জানি দিনটা কেমনভাবে কাটিবে এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়, সে জাতি যে সনাতনধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে—এ কথা জনকয়েক প্রাচীনপন্থী জাত্যভিমানী, স্তব্ধ ও তুচ্ছ স্বার্থ রক্ষার্থ স্বজাতিদ্রোহ করিতে অপরাঙ্মুখ—ব্যক্তি ছাড়া আর কে বিশ্বাস করিতে পারে? ধর্ম্মের গ্লানি হইলে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য যে, যে পর্য্যন্ত ভগবানের শুভাগমনের শুভ সময়ে ধর্ম্মের জন্য—তাঁহার আদেশ প্রতিপালনের জন্য—দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষ্যা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দলে দলে আত্মত্যাগ করিবার জন্য জাতি প্রস্তুত না হইতে পারিয়াছে, সে পর্য্যন্ত তিনি আসেন না। ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে, অধর্ম্মের

অভ্যুদয়ে—ভারত শান্তি-সুখহীন হইয়াছে—ইহা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মকে লাভ করিবার জন্য—ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বুঝিবার জন্য এবং তাহা বুঝিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য সকল স্বার্থ হাসিতে হাসিতে বিসর্জ্জন করিবার জন্য এখনও ভারত বদ্ধপরিকর হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিনে তিনি নিশ্চয়ই আসিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি যাহাতে শীঘ্র আসেন, আসিয়া হিন্দুজাতির ভাগ্যাকাশে যে সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্মাবনতিরূপিণী ঘোর ঘনঘটা সহস্রাধিকবর্ষ ব্যাপিয়া ছাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সত্যনির্ভরতার প্রবল বাত্যা উঠাইয়া এক মুহূর্ত্তে অপসারিত করিয়া দেন, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। সেই জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে মিথ্যা-ব্যবহৃতিরূপিণী করাল রাক্ষসীকে আমাদিগের সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে ঘৃণায় পদাঘাত করিয়া—বিবেকের সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে তাড়াইতে হইবে, ইহাই হইতেছে প্রথমতঃ অদ্য আপনাদিগের সমক্ষে আমার ঐকান্তিক নিবেদন।

মিথ্যাব্যবহার আমাদের হিন্দু সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে কেমন ভীষণভাবে আঁকড়াইয়া বসিয়াছে, সংস্কারের বশে—অভ্যাসের বশবর্ত্তিতায় কত মিথ্যা আচারকে—কত মিথ্যা ব্যবহারকে—কত মিথ্যা জ্ঞানকে, আমরা সত্য বলিয়া শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ও মহর্ষিগণের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছি। শুধু কি তাহাই? তাহাদের উচ্ছেদের জন্য যাহারা সত্যকথা বলিতে সাহস করিতেছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মবিপ্লাবক বলিয়া, কালাপাহাড় বলিয়া গালি দিয়া, নিজ নিজ ধার্ম্মিকতা জাহির করিবার জন্য প্রবল উৎসাহের সহিত সভা সমিতিও করিতেছি।

এই সকল ধর্ম্মবিগর্হিত কপট ব্যবহার আমাদিগকে অবিলম্বে

পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গুরু, ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুসমাজ চলিতে পারে না, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে—কি করিয়া সেই ব্রাহ্মণ্য অর্জ্জন করিতে হয়, তাহার জন্য কাহারও চেষ্টা বড় একটা দেখা যায় না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ সমাজের গুরু হইবে, সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক হইবে, এরূপ কথা হিন্দুশাস্ত্রের কোন স্থলেই লিখিত হয় নাই। প্রত্যুত ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥

জ্ঞানের আধিক্যবশতঃই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। অধিক বীর্য্য-শালী হইলেই ক্ষত্রিয়কুলমধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ধনধান্য প্রভৃতি অধিক সম্পত্তি-শালীই বৈশ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় এবং জন্মনিবন্ধন জ্যেষ্ঠতা শূদ্রের মধ্যেই হইয়া থাকে।

যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী বা চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ, প্রকৃত হস্তীও নহে, প্রকৃত মৃগও নহে, কেবল নামমাত্রই ধারণ করে, তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ যথা-বিধি সমগ্র বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা না করেন, তিনিও প্রকৃত ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে সমর্থ হন না, কেবল "ব্রাহ্মণ" এই নামমাত্রই ধারণ করিয়া থাকেন।

বয়স অধিক হইলেই, কেশশ্মশ্রু প্রভৃতি পলিত হইলেই, বিপুল ধন-

শালী অথবা বহু-বন্ধু-সম্পন্ন হইলেই যে ব্রাহ্মণ মহান্ হয়, তাহা নহে, কিন্তু যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া তাহার অধ্যাপক হয়েন, তিনিই প্রকৃত মহান্, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

মনু আরও বলিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

বর্ত্তমান সময়ে—শুধু বর্ত্তমান সময়েই বা কেন? সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হিন্দু সমাজ মধ্যে যে হইতেছে তাহা আমরা সকলেই জানি। মাধবাচার্য্যের ন্যায় প্রাচীন প্রামাণিক নিবন্ধকারও পরাশরভাষ্যে স্পষ্টই ইহাই বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে যথাবিধি সময়ে উপনীত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদপাঠের অনুকূল ব্রতসমূহ প্রতিপালন পূর্ব্বক—সাঙ্গোপাঙ্গ-বেদের অধ্যয়নপূর্ব্বক, বেদাদি শাস্ত্র-সমূহের অধ্যাপন করিতে সমর্থ একজন ব্রাহ্মণও দেখিতে পাওয়া যায় না, এরূপ অবস্থায় এই বর্ত্তমান বিদেশীয় প্রভাবশালী সুচতুর জাতিগণের সহিত ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে—সনাতন ধর্ম্মের উপর ব্যবস্থিত হিন্দুসমাজের পরিচালনার ভারগ্রহণ করিতে সমর্থ একজন ব্রাহ্মণ ও যে বিদ্যমান নাই, একথা ব্রাহ্মণ্যাভিমানী অথচ ব্রাহ্মণ্যহীন জনকয়েক তথাকথিত নেতার নিতান্ত শ্রুতিকটু ও অরুন্তুদ হইলেও, ইহা যে বর্ণে বর্ণে বাস্তব সত্য—তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের অভিমানে হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব করিবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর, এই নব জাগরিত অভ্যুদয়োন্মুখ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যে যুগানুসারে ঐহিক ও পারত্রিক সামাজিক মঙ্গল বিধানের জন্য—

আপনাদিগকে শক্তিশালী করিবার জন্য—সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে সম্মানের আসনলাভ করিয়া গৌরবের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য, হিন্দুশাস্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক সময়োপযোগী ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লইবেই, তাহাতে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইবার কোন কারণই বিদ্যমান নাই।

ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতে হইলে, গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, সদাচারশিক্ষা ও ধর্ম্মময় চরিত্রমণ্ডিত জীবনগঠন যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে; তাহা না করিয়া জিদের উপর নির্ভর করিয়া গত পাঁচ শত বৎসরের মত আজও শিক্ষাহীন—দীক্ষাহীন—আচারহীন—শুদ্ধিহীন—তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যের দোহাই দিয়া—দল বাঁধিয়া চীৎকার করিলে, কোন ফলই হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া আজ জীবন রক্ষাও যুগানুরূপ ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, হিন্দুসমাজ যে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে বাধাপ্রদান যাঁহারা করিতেছেন, অচির কালের মধ্যেই প্রবলস্রোতের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাঁহারা যে ভাসিয়া যাইবেন, তাহা আজ সমগ্র ভারতে শিক্ষিত হিন্দুমাত্রই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। অশিক্ষিত সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কালসার হিন্দুসমাজের প্রাণহীন কাঠামোখানাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন - মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া সত্যসনাতন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার বুজরুকীতে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকসমূহকে বিপথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা হিন্দুসমাজের অহিতকারী বর্ত্তমান সময়ে আর কেহই হইতে পারে না—ইহাই হইল, বর্ত্তমান সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের নবজাগরিত সমস্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজের দৃঢ়বিশ্বাস।

দল বাঁধিয়া, দলাদলি করিয়া, গ্রামের মধ্যে—পল্লীর মধ্যে—

সজাতিগণের মধ্যে ভীষণ ঈর্ষ্যা ও কলহের সৃষ্টি করিয়া, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান সময়ে কোন উন্নতিই হইবে না, প্রত্যুত ধ্বংসের পথ তাহাতে ক্রমশঃই সুগম ও বিস্তৃত হইবে—একথা যাঁহারা না বুঝেন বা বুঝিয়াও নিজেদের পদমর্য্যাদা, জীবিকা ও অহঙ্কার বজায় রাখিবার জন্য নব্যপন্থী-দিগকে গালি দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বিজয়যাত্রার জন্য অগ্রসর হইবার মঙ্গল মুহূর্ত্ত হিন্দু-সমাজে আসিয়াছে। এই সুসময় উপেক্ষণীয় নহে, যাহা সমাজের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজশরীরকে বিষের ন্যায় জর্জ্জরিত করিতেছে—তাহাকে অগ্রে ছাঁটিয়া বাহির করিতেই হইবে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, পুণ্যভারতভূমিতে হিন্দুকুলে জন্মলাভ করিয়া তাহার সাফল্যসম্পাদন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য—মিথ্যার হস্ত হইতে—কুসংস্কারের করাল গ্রাস হইতে—ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের প্রতিকূল কদাচারসমূহ হইতে হিন্দুসমাজকে বিনির্ম্মুক্ত করা।

বাংলাদেশে আজকাল শুনিতে পাই বাল্যবিবাহের সংস্থাপন ব্যতিরেকে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ও বিশুদ্ধত্ব রক্ষা হইবে না, হিন্দুসমাজ যুবতী কন্যার বিবাহ দিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রসাতলে যাইবে—এইরূপ একটা চীৎকার বাংলার আকাশপবনকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে! আমি কিন্তু, আপনাদিগের সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—বাংলার এই যে আন্দোলন, ইহা মিথ্যার উপরই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার দোহাই দিয়া হিন্দুসমাজকে আবার পাঁচশত বৎসর পিছাইয়া দিবার যে চেষ্টা, তাহা কখনই সফল হইতে পারে না, ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

অতীত পাঁচশত বৎসরের বাংলার ও বাঙ্গালী সমাজের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বাংলার

হিন্দুসমাজের মূর্দ্ধণ্য ব্রাহ্মণ প্রধানগণ—পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্ব হইতেও এই বাঙলায় কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কুলীনগণের মধ্যে ঋতুমতী কন্যার বিবাহ যে হইত, এখনও হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এ প্রকার যুবতী কন্যার বিবাহ অবস্থাবিশেষে যে ঋষিগণেরও সম্মত, সে বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রমাণের অভাব নাই। সাক্ষাৎ মনু ভগবান্ই বলিতেছেন—

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নত্বেবৈনাং প্রযচ্ছেত্ত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

দুহিতা কন্যাবস্থায় ঋতুমতী হইয়াও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গৃহে বিদ্যমান থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মনের মতন গুণসম্পন্ন পাত্র ব্যতিরেকে অন্য কাহারও হস্তে পত্নীরূপে কখনও তাহাকে দান করিবে না।

এই মনু-বচনকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার কুলীনসমাজ স্মরণাতীত কাল হইতে উপযুক্ত পাত্র না জুটিলে কন্যার বিবাহ দেয় নাই। ঋতুমতী কন্যা হইলে পিতৃ পুরুষগণ নরকস্থ হ'ন—এই শাস্ত্রীয় শাসনবাক্য প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজকে ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা বাঙ্গালার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে।

সরদার আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য, তাহাকে উল্টাইয়া দিবার জন্য, 'ধর্ম্ম গেল' 'সমাজ গেল' 'হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করিতেছেন,—দলাদলি পাকাইতেছেন—সমাজসংস্কারক দলের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগের মিথ্যাচারপরায়ণতা—মিথ্যাকে সত্যের আবরণে সাজাইয়া অজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলি-প্রক্ষেপের চেষ্টা যে অরণ্যে রোদনে পরিণত হইতেছে, তাহা

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিয়া থাকেন। আমি আপনাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—আমাদিগের সামাজিক প্রথা রাজার আদেশানুসারে অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্ত্তিত আইন অনুসারে হিন্দুসমাজে চলুক, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা কোন হিন্দুই মানিতে চাহে না, এবং না মানাই উচিত, কারণ, সামাজিক ব্যবহারে রাজকীয় নিয়মের বশবর্ত্তিতা হিন্দু সমাজের জীবনহীনতারই পরিচায়ক। কিন্তু, তাই বলিয়া সারদাবিলের প্রবর্ত্তন হইলে হিন্দুসমাজ ধর্ম্মহীন হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রসাতলে যাইবে—এরূপ উক্তি যে নিতান্ত অসার ও বঙ্গের আবহমনকাল প্রচলিত শিষ্ট-সমাজের অনুমোদিত নহে, ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে আপনাদিগের নিকট বলিতে পারি। এই সকল মিথ্যাব্যবহারে সমাজের উন্নতির পথকে জটিল করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করার বা জিদ্ বজায় রাখার সময় এদেশ হইতে কালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে, আর কখনও যে ফিরিবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই। তাই বলিতেছি, হিন্দুসমাজের পরিচালনের ভার হিন্দুরই হস্তে থাকা উচিত, চিরদিন তাহাই ছিল, এখনও তাহা যাহাতে থাকে তাহার জন্য প্রত্যেক হিন্দুর চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমরা অতীত যুগে পৃথিবীর সকল জাতির গুরু ছিলাম, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে, কলাকৌশলে, বীর্য্যে, বদান্যতায় ও তপঃপ্রভাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতুলনীয় ছিলেন, এই কথাগুলি বার বার আবৃত্তি করিয়া মনঃসন্তোষ-লাভ-পূর্ব্বক আরামে নিদ্রা যাইবার সময় আর নাই। আমাদের সমাজ চতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যতিরেকে হিন্দুসমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা খাঁটি সত্য—কিন্তু, এই কথা বলিয়া মুখে আস্ফালন করিয়া লাভ কি? ক্ষমা, সন্তোষ, তপস্যা, সরলতা, উদারতা, শ্রৌতজ্ঞান ও ত্যাগশীলতা প্রভৃতির

অভাবে আমাদের ব্রাহ্মণ্যশক্তি লুপ্তপ্রায়। বাণিজ্য আমাদের পরহস্তগত হওয়ায় বৈশ্যশক্তি আজ ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। একশত লক্ষ পাউণ্ড বা পনের শত কোটি রজত মুদ্রা—মূলধন এক ইংলণ্ডই এই দেশে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া এদেশের সকল প্রকার বাণিজ্যের উপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দেশের মূলধন যে এদেশে কত খাটিতেছে তাহার হিসাব না হয় এখানে নাই করা গেল। আমরা দারিদ্র্যের পীড়নে উদরান্নের সংস্থান করিতেই ক্রমে অপারক হইয়া পড়িতেছি, বাণিজ্য করিব কাহার বলে? আমাদের দেশের যাঁহারা বণিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈদেশিক বণিকের দালালীই করিয়া থাকেন। বৈদেশিক বণিকের তুলনায় তাঁহাদের মূলধন যে নিতান্ত নগণ্য, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। সুতরাং বৈশ্য শক্তিও যে আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য। আর ক্ষত্রিয় শক্তি! তাহা ত বহুকাল হইতেই অন্তর্হিত। সুতরাং প্রকৃত কথা দাঁড়াইতেছে এই যে—হিন্দুসমাজ আজ ত্রৈবর্ণিক-হীন, আছে কেবল শূদ্র অর্থাৎ দাস—সে দাসত্বও প্রাচীন কালের ন্যায় দ্বিজাতির দাসত্ব নহে, কিন্তু, তাহা প্রভাবশালী বৈদেশিক জাতির দাসত্ব এইরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য সকলে মিলিয়া উচ্চনীচ-অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হইবে, নিজেদের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা ও কলহ পরিত্যাগ করিয়া, যথার্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য প্রাণাতিপাতী পরিশ্রম করিতে হইবে। কেবল জন্মগত ও গুণবর্জ্জিত বর্ণবিভাগও এদেশ হইতে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে, ততই দেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। সত্যযুগের ন্যায় আবার এই দেশে গুণকর্ম্মগত বিশুদ্ধ বর্ণবিভাগ যে পর্য্যন্ত সংস্থাপিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত এদেশে সুখ ও শান্তি আসিতে পারে না—এই জাজ্বল্যমান ধ্রুবসত্যকে উপেক্ষা করিয়া

বেশীদিন বসিয়া থাকিলে, হিন্দুসমাজ যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া সর্ব্বনাশ গ্রস্ত হইবে, ইহা এখন প্রত্যেক হিন্দুকেই বুঝিতে হইবে।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে—হিন্দুর শাস্ত্র এখন আর জনকয়েক টোলধারী পণ্ডিতের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুর বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থ ক্রয়পূর্ব্বক অনুশীলন করিবার অধিকার আজ প্রত্যেক হিন্দুরই হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এখনও সভায় বা সংবাদপত্রে সংঘবদ্ধ হইয়া, শূদ্রের শ্রুতিপাঠে, ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে, বা পুরাণপাঠে অধিকার নাই—শূদ্র যদি পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ করে, তবে তাহার পরলোকে নরকপাত অনিবার্য্য, শূদ্র—পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি মূল সংস্কৃতগ্রন্থ পড়িলে হিন্দু-ধর্ম্ম রসাতলে যাইবে—এই সকল অসত্যবাক্যের ঘোষণা দ্বারা ভারতে সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিবার বৃথা আস্ফালন করিতেছেন, তাঁহাদের নেতৃ-বর্গই মুদ্রাযন্ত্রব্যবসায়ীর অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া—হিন্দুধর্ম্মের মূলগ্রন্থ শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসমুদ্রণে সম্পাদকতার ভার গ্রহণপূর্ব্বক—দেশের মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থ সুলভ মূল্যে ছড়াইয়া দিতেছেন—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুকে হিন্দুশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য কি—তাহা বুঝিবার অবসর দিতেছেন—ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা, বড়ই সুখের বিষয়। তাঁহারা মনে মনে যাহা চাহেন না—কার্য্যতঃ, কিন্তু, বাধ্য হইয়া তাহাই করিয়া বসিয়াছেন,—ইহা দেখিয়া মনে হয়—ইহা শ্রীভগবানের প্রেরণা, এইরূপ অচিন্ত্য কার্য্য করিবার অনুকূল-শক্তি-নিচয় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ। তাই তিনি যথার্থই অর্জ্জুনকে স্পষ্টভাবে গীতাতে বলিয়াছেন—

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।

মোহবশতঃ যাহা তুমি করিতে চাহিতেছ না, অবশ হইয়া তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।

ঐ সকল সুলভ মূল্যে প্রচারিত হিন্দু শাস্ত্ররূপ অমূল্য রত্নরাজি আজ

হিন্দুমাত্রেরই অনায়াসলভ্য হওয়াতে, হিন্দুজাতি ঐ সকল শাস্ত্ররূপ আলোকের সাহায্যে মোহনিদ্রার করালকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার পথ দেখিতে পাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর পক্ষে অন্য আর কি হইতে পারে? গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে পূর্ব্বে আমি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি। এই চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ যে গুণকর্ম্মগত, তাহা ভগবান্ বেদব্যাস আরও স্পষ্ট করিয়া মহাভারতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভি বর্ণতাং গতম্॥

বর্ণ সমূহের মধ্যে কোন বিশেষ নাই—এই জগৎ সকলই ব্রাহ্ম, কারণ ব্রহ্মা পূর্ব্বে সকল মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই পৃথক পৃথক্ বর্ণ হইয়াছে।

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
গুণক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে এই সংসারে একই বর্ণ ছিল, কালে গুণ ও কর্ম্মবিশেষের বৈলক্ষণ্যবশতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহর্ষি আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণো জঘন্যংবর্ণমাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ॥

নিম্নবর্ণের লোক ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণকে প্রাপ্ত হয়, কারণ তখন তাহার জাতি পরিবৃত্তি হইয়া থাকে। এবং উচ্চ বর্ণ ও অধর্ম্মাচরণের ফলে জাতিপরিবৃত্তিবশতঃ উৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়া থাকে। পরাশর বলিয়াছেন—

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নোগুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

শূদ্র ও সদাচার সম্পন্ন ও গুণবান্ হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, আবার ব্রাহ্মণও যদি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে শূদ্র হইতেও অধম হইয়া থাকে।

মনুই বলিতেছেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যায়। এইরূপ গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক রাশি রাশি শাস্ত্রীয় বচন হিন্দুর সকল প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু যখন উন্নতির চরমসীমায় উপনীত—পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির গৌরবাবহ উচ্চসিংহাসনে হিন্দু আচার্য্যরূপে উপবিষ্ট হইয়াছিল, তখন এই সকল শাস্ত্রীয় বচনানুসারেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত। এ বিষয়ে সাক্ষী—হিন্দুর শাস্ত্রসমূহ—এখনও লুপ্ত হয় নাই। এইসকল শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচার ও তাহার উদার ও অকপট ব্যাখ্যা—যাহাতে প্রচুরভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে হইবে, ইহাই হইল বঙ্গে নবজাগরিত হিন্দুর প্রথম কর্ত্তব্য। কলিযুগ আসিয়াছে বলিয়া তাহার ভয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া, কেবল পরকালের চিন্তায় সময় যাপন করাকে আমি কাপুরুষতা বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের সামাজিক ও আধ্যা-

ত্মিক উন্নতি হইবার দিন চলিয়া গিয়াছে—এইরূপ ভাবনাই আমাদিগকে দিন দিন অবসাদের দিকে—মৃত্যুর পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। কলিযুগ আসিয়াছে—আমরা তাহাতে ভয় পাইব কেন? প্রত্যুত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জঘন্য স্বার্থের রাক্ষসী তৃষ্ণাকে দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, আমাদেরই পূজনীয় মহর্ষিগণের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আমরাই নিজ শক্তির প্রভাবে অচিরকালের মধ্যে সত্যযুগকে ফিরাইয়া আনিব, ইহাই আমাদিগের প্রতিজ্ঞা হউক। এই সত্য প্রতিজ্ঞাকে সফল করিবার জন্য আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইব, অসত্যকে অনাচারকে—কপটতাকে—ভীরুতাকে—অবসাদকে, উদারনৈতিক জাতীয়শিক্ষার তীক্ষ্ণখড়্গের আঘাতে আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবই করিব। আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণ—গুণে, জ্ঞানে, গরিমায়, ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে ও আধ্যাত্মিকতায়—ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ উন্নতির যে তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন, আমরা যদি তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরাই পরমুখাপেক্ষা পরিহার করিয়া—নিজ সামর্থ্যে তদপেক্ষা তুঙ্গতর অভ্যুদয়শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া কেন ভারতে মনুষ্যজন্মলাভের পূর্ণ সার্থক্য সম্পাদন করিতে পারিব না? দৈব আমাদের প্রতিকূল ইহা আমি মানি না। ঋষিগণের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি প্রতিকূল দৈবের ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া থাকিতেন। আমাদেরই পূজনীয় পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাবদন্তি।

নিজের শক্তি দ্বারা দৈবকে বিধ্বস্ত করিয়া পুরুষকার অবলম্বন কর—

দৈবই আমাদিগকে সব দিয়া থাকে, এই কথা কাপুরুষগণই বলিয়া থাকে।

হিন্দুসমাজের অন্তর্গত নানাপ্রকার জাতি ও উপজাতির মধ্যে আপেক্ষিক উচ্চনীচ ভাবের বোধ ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যত্বের চিরসঞ্চিত সংস্কার হিন্দুজাতিকে এক হইতে দিতেছে না, বরং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয়-ভাবে অভ্যুদয় লাভ করিবার পথে দুরতিক্রমণীয় কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কণ্টক হিন্দুকেই তুলিয়া ফেলিতে হইবে। সনাতন সত্যধর্ম্মের স্বরূপ হিন্দু ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে—সেই সনাতন সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছেন শ্রীভগবান্ বাসুদেব।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যাত্যন্তিকস্য চ॥

অমৃত, অব্যয় ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা, শাশ্বতধর্ম্ম ও আত্যন্তিক সুখের আমিই আশ্রয়।

শাশ্বত-সত্যধর্ম্মের যিনি একমাত্র আশ্রয়, সেই করুণাময় শ্রীভগবান্কে আশ্রয় করিতে না পারিলে, কেহই কোন প্রকার সংসার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না—এই ধ্রুবসিদ্ধান্ত আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। দেহাত্মবাদের দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তীব্র আলোকচ্ছটায় আমাদিগের চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে বসিয়াছে, আমরা অহমিকাসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছি, এত বড় বিপদে পড়িয়া যেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে, যেমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে—অনায়াসে অবিলম্বে এই সকল প্রকার বিপদ্-জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকা,

তেমন করিয়া তাঁহার শরণ লওয়া—আমাদের পক্ষে ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ—আমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার, পাশ্চাত্ত্য ভাবের ও পাশ্চাত্ত্য অহমিকার তীব্রমদিরাবশে বিভোর হইয়া পড়িতেছি, এইভাবে এই নাস্তিক্যময়-ভারতবিরুদ্ধভাব আমাদিগকে বর্জ্জন করিতেই হইবে, একথা ভুলিলে চলিবে না। আমাদিগের প্রাচীন জাতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। তাঁহাকে ডাকিবার—তাঁহার শরণ লইবার অধিকার সকল মনুষ্যেরই আছে, তাঁহার পূজায়, তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার ভজনে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার আছে, ও চিরদিন থাকিবে- ইহাই হইল সনাতন ধর্ম্মের সারসিদ্ধান্ত। তাই ভাগবত বলিতেছে—

ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্রুতস্য চ
স্বিষ্টস্য জপ্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিপ্লুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
সদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥

নরমাত্রের—তপস্যার, বিদ্যার, যজনের, জপের, জ্ঞানের ও দানের অখণ্ডিত ইহাই ফল যে, মানুষ ভক্তিভরে উত্তমশ্লোক সেই ভগবানের গুণলীলা কীর্ত্তন করে। অর্থাৎ অসদাচারবর্জ্জনপূর্ব্বক সদাচার গ্রহণ দ্বারা বিশুদ্ধ ও অকপটচিত্তে প্রতিদিন মানব-যে কোন বর্ণেরই অন্তর্গত হউক না কেন—যদি ভগবানেরই গুণলীলার কীর্ত্তন করে, তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চিতভাবে তপস্যা—অধ্যাত্মবিদ্যা, যাগযজ্ঞ, জপ ও দান প্রভৃতি সকল সৎকর্ম্মেরই ফললাভ করিতে সমর্থ হয় ও অধিকারী হয়। ইহাই কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রতিপালন যাহাতে প্রতিদিন প্রত্যেক হিন্দু—অন্ততঃ একবার

করিয়াও—সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে করে—তাহারই জন্য বিশেষ চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। এই সনাতন ধর্ম্মের প্রতিপালন যাহাতে সমাজমধ্যে বিশ্বজনীনভাবে হইতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। এইরূপে, সংঘবদ্ধভাবে ভগবানের লীলা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনে আমাদের হৃদয়ের সকল প্রকার কালুষ্য—সকল প্রকার দুরভিমান দূর হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনে নবউৎসাহের সঞ্চার হইবে। যে দুরভিমানবশতঃ আমাদিগের দৃষ্টি কলুষিত হইয়াছে, সে দুরভিমান দূর হইয়া যাইবে, বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইবে, সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হইব। সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে যে উচ্চনীচভাবের জ্ঞান বশতঃ আমরা কিছুতেই এক হইতে পারিতেছি না, সে উচ্চনীচ ভাবের অহমিকা আপনিই সরিয়া যাইবে। সেই সময় যতশীঘ্র আমাদের দেশে আসে তাহাই সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। জাতির অভিমান, কুলের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও বিশুদ্ধতার অভিমান আমাদের সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়াছে, অগণিত ভীষণ কলহের সৃষ্টি করিতেছে। এসকল অভিমানকে চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পারিলে, হিন্দুজাতি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা হিন্দুসভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবে না, ইহা প্রত্যেক হিন্দুকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া নির্ভীকচিত্তে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় নাই—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই কথাই জানাইবার জন্য আমি আপনাদিগের নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছি। আশা করি, আপনাদিগের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন অরণ্যরোদনে পরিণত হইবে না।

পরিশেষে—আমার আর একটী বিশেষ নিবেদন এই যে, আমাদের

সমাজে শাস্ত্রানুসারে যুগানুকূল ধর্ম্মের পুনর্গঠন করিতে হইবে। যে ভাবে ৫।৬ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা চলিয়া আসিতেছি, সে ভাবে আর যে আমরা চলিতে পারিতেছি না, চলিতে পারাও অসম্ভব,তাহা স্থিরবুদ্ধি এবং সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝেন। সুতরাং পরিবর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী ও আশুকর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজসংস্কারের ব্যপদেশে আমাদের সমাজমধ্যে শাস্ত্রাননুমোদিত ও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন যাহাতে না-হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে প্রযত্ন করিতে হইবে। গুণ ও কর্ম্মগত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিতে যাইয়া আমরা যেন বর্ণাশ্রমের ধ্বংস না করিয়া বসি—সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সকলেই হইতে পারে—একথা অনেক সমাজসংস্কারকের মুখে আজকাল শুনিতে পাই এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হউক, এইরূপ প্রস্তাবও সভাসমিতিতে গৃহীত হইতেছে। আবার শুধু প্রস্তাবই গৃহীত হইতেছে, তাহা নহে, প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সভাক্ষেত্রেই যজ্ঞসূত্রবিতরণ ও গায়ত্রী উপদেশের দ্বারা ক্ষণমাত্রেই দলে দলে ব্রাহ্মণসৃষ্টিও হইতেছে—এ দৃশ্য নিতান্ত বিরল নহে। আমি এই প্রকার এক নিঃশ্বাসে দলে দলে ব্রাহ্মণসৃষ্টিকে ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংহারক বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ এক কথায় বা একদিনে হয় না, যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে, যে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়ানিচয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠানদ্বারা যথার্থ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইতে পারে, সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ, অপরে ব্রাহ্মণ নামধারী মাত্র। নামধারী ব্রাহ্মণের অজ্ঞতা ও তন্মূলক অসংখ্য অনাচারে ও অত্যাচারে হিন্দুসমাজ আজ এই ভীষণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আবার সেই গুণবর্জ্জিত ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণের অগণিত দল সৃষ্টি করিয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতে যাঁহারা চাহেন—

তাঁহাদের স্বজাতির উন্নতির জন্য তীব্র আবেগ ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু, হিন্দু সমাজতত্ত্ববিষয়ে তাঁহাদের গভীর অজ্ঞতা ও তন্মূলক হঠকারিতা যে হিন্দুসমাজের পক্ষে বিশেষ ভয়াবহ—ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গুণগত ও ক্রিয়াগত—ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গুণক্রিয়াগত বর্ণাশ্রমবিভাগ সুশৃঙ্খলভাবে দীর্ঘকাল প্রবর্ত্তিত থাকিলে, তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আপনা আপনিই জাতি ও জন্মগত হইয়া পড়ে—কিন্তু, আবার যখন গুণক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহা কেবল জাতিগত হইয়া দাঁড়ায়, তখনই ইহা সমাজের উন্নতির অন্তরায় হইয়া পড়ে—দ্বেষ, কলহ, অনৈক্য, অসন্তোষ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়া সামাজিক সংঘশক্তিকে ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপ বিষম অবস্থায় যখনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আসিয়া পড়ে, তখনই আবার ইহাকে গুণকর্ম্মবিভাগের উপর সংস্থাপিত করিতে হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সত্যের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী হইয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রসমূহের পরিশীলন করিলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই দ্বৈরূপ্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। জাতিগত বর্ণাশ্রম ও গুণক্রিয়াগত বর্ণাশ্রমের সমর্থক ও বিরোধী শাস্ত্রীয় বচনসমূহের মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের প্রকৃত সমন্বয় কি—তখন তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। আমাদের যেন সর্ব্বদা মনে থাকে—আমরা কেবল ব্রাহ্মণ, কেবল ক্ষত্রিয়, কেবল বৈশ্য বা কেবল শূদ্র চাহিনা —আমরা চাহি ব্রাহ্মণ—আমরা চাহি ক্ষত্রিয়—আমরা চাহি বৈশ্য—আমরা চাহি শূদ্র—এই চারি বর্ণের কোনটীকেই আমরা ছাড়িতে পারি না। মনুষ্যসমাজের পূর্ণতা এই সুনিয়ন্ত্রিত—দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত ও একই মহান্ লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত—বর্ণাশ্রমপ্রবিভাগের উপর ঐকান্তিক-ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে—ইহাই হইল ঋষিগণের সিদ্ধান্ত, ইহাই

হইল হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মূল রহস্য। এই বর্ণাশ্রমে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার অনুমাত্রও স্থান নাই। জাতিগত গুণবর্জ্জিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে—তাহার পুনঃ সংস্কার ব্যতিরেকে সনাতনধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে না। সেই সংস্কার যাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী হয়, সংস্কারনামধারী সংহারের রূপান্তর না হয়, তাহারই জন্য যে অকপট সত্য ব্যবহার পূর্ণ আন্তরিক প্রবৃত্তি, তাহা ছাড়া হিন্দুজাতির বাঁচিয়া থাকিবার—বড় হইবার ও ঐহিক—পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল লাভ করিবার অন্য কোন সাধন নাই—ইহাই আপনাদের নিকট আমার অদ্যকার শেষ নিবেদন।

হিন্দু-সমাজ-সমস্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গত বৈশাখে বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার চতুর্থবার্ষিক অধিবেশনে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি, তাহার আলোচনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে উৎসাহ পাইয়াছি। আমাদের সমাজে এই অভিভাষণে একটা নূতন ভাবের যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহার পরিণাম যে আমাদের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের সমাজ এক্ষণে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের যে ঐকান্তিক আবশ্যকতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রাচীনপন্থিগণের কেহ কেহ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতুষ্ট নহেন। তাঁহারা এই সমাজকে টানিয়া পিছনের দিকে ঠেলিয়া বর্ণাশ্রমের অতীত আদর্শের উপর এই যুগে আবার সংস্থাপিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ দিকে নব্যপন্থিগণও প্রাচীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর নহে, কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও তাহা দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দু জাতির যাহা প্রকৃত কল্যাণ, তাহা সাধিত হইতে পারিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাসম্পন্ন হইয়া, বর্ণাশ্রমের সংস্কার ও পরিবর্ত্তন দেশ,

কাল ও পাত্রানুসারে করিবার জন্য ক্রমশঃই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। হিন্দু সমাজের এই প্রকার মতদ্বৈধ ও তন্মূলক কলহ ও বিদ্বেষ প্রভৃতি এমন ভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া সমাজের অভ্যুদয়কামী, সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। ক্রমশঃ চারিদিকে অশান্তির অনলই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ধীরভাবে অপক্ষপাতহৃদয়ে সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার শক্তি সমাজের ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে গালি দিতেছে। অপর পক্ষ প্রতিবাদিগণের সঙ্কীর্ণতার প্রতি উপহাস করিয়া নিজের মত দল বাঁধিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই হইল বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। এ অবস্থায় প্রকৃতভাবে স্বজাতির ও স্বদেশের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, ইহাই ময়মনসিংহ—অভিভাষণে আমি স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি। নব্যভাবে শিক্ষিত স্বজাতিহিতৈষী মহানুভব-গণ আমার অভিভাষণের এই মুখ্য তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, বহু সংবাদ-পত্রে যে ভাবে আমার মত সমর্থন ও অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি আশান্বিত হইয়াছি, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অপর দিকে প্রাচীনপন্থীদিগের কতিপয় পণ্ডিত আমার অভিভাষণ পাঠ করিয়া বা লোকমুখে শুনিয়া আমার প্রতি নিতান্ত বিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। আমার অভিভাষণের ফলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া সভা-সমিতি করিয়া আমার অদূরদর্শিতা ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের কোন কোন নেতৃ-প্রধান মহোদয়ের এই প্রকার সদয় ব্যবহারেও আমি যথার্থই আনন্দ

অনুভব করিতেছি। এই বিশ্বতোমুখ সামাজিক অবসাদের দিনে এরূপ উৎসাহবৰ্দ্ধক আনন্দ অযাচিতভাবে পূর্ণমাত্রায় তাঁহারা এই অকিঞ্চনকে দিতেছেন এবং সেই সঙ্গে আমার এই বার্দ্ধক্যের একঘেয়ে জীবনে নূতন আশা ও কার্য্যকরী শক্তির সঞ্চার করিয়া, আমাকে আমার প্রিয়তম সমাজের সেবার উপযোগী করিয়া তুলিতেছেন, এই জন্য আমি তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার অভিভাষণে যে কয়টি প্রস্তাব আমি করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে শুদ্ধি ও বালবিধবাবিবাহ এই দুইটি বিষয়েই সনাতনীদিগের নায়কম্মন্য কতিপয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশেষ আপত্তি করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে ভিন্নধৰ্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে শুদ্ধি দ্বারা সনাতন হিন্দুসমাজে সমুন্নতভাবে প্রবেশ করিতে দিলে সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে, এইরূপে বিধর্ম্মিগণেরও হিন্দুসমাজে প্রবেশ হিন্দুশাস্ত্রবিহিত নহে। আমি কিন্তু বলিয়াছি, শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুসমাজের উচ্ছেদ হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত এইরূপ শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুসমাজের পরিপুষ্টি হইবে, এবং তাহা দ্বারা হিন্দুমাত্রেরই ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্র-সমূহ এই প্রকার শুদ্ধির বিরোধী নহে, প্রত্যুত এই প্রকার শুদ্ধির বিধান হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে প্রচুরভাবেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু ধৰ্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসও এই শুদ্ধি যে অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুসমাজে হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই বিষয়ে আমি যে সকল প্রমাণ আমার অভিভাষণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদিগের প্রামাণ্য কেহই এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেই সকল প্রমাণ-বচনের সরল সহজ বুদ্ধিগম্য ও পূর্ব্বাপর—অবিরুদ্ধ তাৎপর্য্য আমি যাহা দেখাইয়াছি,

তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অথবা বুঝিয়াও সংস্কারের বশে যুক্ত্যাভাস ও প্রমাণাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারা আপনাদিগের জিদ বজায় রাখিবার জন্য আমার উপর রাশি রাশি অপবাদ-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রকার রীতি অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিসাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে দ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি করিয়া উন্নতির অন্তরায়ই হইবে, প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে কখনই পারিবে না —এই কথা এক্ষণে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই বেশ বুঝিয়াছেন। সুতরাং আমার বিরুদ্ধবাদিগণের বৃথা আস্ফালনে ও 'ধর্ম্ম গেল', 'দেশ গেল', 'সমাজ গেল'—এই প্রকার চিরাভ্যস্ত দিগন্তভেদী চীৎকারে, সমাজ-হিতৈষী, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে সমুদ্যত উপচীয়মান শিক্ষিত সমাজের কোন প্রকার ভীতি বা তন্মূলক পশ্চাৎ-পদতার যে অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই, তাহা এখনও যদি প্রতিবাদপরায়ণ পণ্ডিত মহাশয়গণ না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষ তাঁহাদেরই।

আমি শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা পরিহার সম্বন্ধে কোন নূতন পথ অবলম্বন করি নাই। কলিযুগপাবনাবতার দীনতারণ পতিতপাবন করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব, প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে পথ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর গৌরবস্তম্ভ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীনিবাস, শ্রীনরহরি, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতি অসংখ্য গোস্বামিগণ পাপী, তাপী, পতিত ও উপেক্ষিত মানবসমূহের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ হিতসাধন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন, আমি সেই পথেরই নির্দ্দেশ আমার অভিভাষণে করিয়াছি। আমি অভিভাষণে বলিয়াছি এবং এখনও নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি যে, বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক যদি

পতিতও অন্ত্যজ প্রভৃতি যথার্থ ভাগবত ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা অস্পৃশ্য থাকে না, তাহারা দানের পাত্র হয়, তাহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে কাহারও পাতিত্য হয় না। জাতি, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও ধনমদে মত্ত হইয়া হরিবিমুখও লোকবঞ্চনার্থ ধর্ম্মধ্বজী ব্রাহ্মণগণ হইতেও তাহারা পবিত্রতর, স্পৃশ্য ও নমস্য হইয়া থাকে—ইহাই হইল সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের পরম ও চরম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে স্বয়ং আচরণ করিয়া অপরকে শিখাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কবিকল্পনা নহে, ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, জাজ্বল্যমান ও অখণ্ডনীয় সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত, অনুমোদিত ও প্রচারিত এই অখণ্ডনীয় সার-সত্য-সিদ্ধান্ত তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বা মস্তিষ্কবিকারপ্রসূত নহে, তাহাই হিন্দুর প্রাণের ধর্ম্ম, তাহাই ঋষিগণের অনন্যসাধারণ সাধনার অমৃতময় পরিণতি, তাহাই সনাতন ধর্ম্মের অবিচাল্য মহাভিত্তি। হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর স্মৃতি, হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর ঐতিহ্য, হিন্দুর অনাদিকাল-প্রবৃত্ত আচার ও ব্যবহার এই সার সত্য সিদ্ধান্তের ঘোষণা চিরদিনই করিয়া আসিতেছে, এবং যত দিন এ জগতে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন অপ্রতিহতভাবে এই ঘোষণাই করিবে।

কলিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছে—

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন চ ভূরিমানঃ।—৭।৯।১০

ব্রাহ্মণ শম, দম, তপঃ প্রভৃতি দ্বাদশগুণসম্পন্ন হইয়াও যদি ভগবান্ নারায়ণের পদারবিন্দে ভক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ

অপেক্ষা চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি বিবেচনা করি—যদি ঐ চণ্ডাল শ্রীভগবানের সেবার জন্য প্রাণ, মন, কর্ম্ম ও অর্থ অকপটভাবে সমর্পণ করে, তাহা হইলে এইরূপ ভগবদ্ভক্ত ঐ নীচজাতিও সকল কুলকেই পবিত্র করিয়া থাকে। বিরাট অভিমান যাহার আছে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও সে যখন স্বয়ংই অপবিত্র, তখন তাহার দ্বারা কোন কুল পবিত্র হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভাগবতসন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভ' গ্রন্থে নিম্নলিখিত গরুড়পুরাণের বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেযা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ! স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছ ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী এবং সেই প্রকৃত পণ্ডিত, সে দানের যোগ্য-পাত্র, তাহা হইতে প্রতিগ্রহও বিধেয়।

শ্রীজীব গোস্বামীর 'ষট্সন্দর্ভে' এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আর একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

যেমন রসশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কাংস্য স্বর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা সকল মনুষ্যই দ্বিজত্বলাভ করিয়া থাকে। এই শ্লোকে 'দ্বিজত্ব' এই শব্দটির অর্থ বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব। এইরূপ তাৎপর্য্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বসম্মত প্রমাণগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসের সনাতন গোস্বামিকৃত টীকাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ-বচন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিস্তারভয়ে ঐ সকল বচন

আমি মৎকৃত অভিভাষণে উদ্ধৃত করি নাই, আবশ্যক বোধ হইলে তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

এই সকল শিষ্ট-সম্মত শাস্ত্রীয় বচনই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পতিতোদ্ধার-রূপ মহাযজ্ঞের প্রমাণ, নিজে আচরণ করিয়া তিনি এই সকল বচনের প্রামাণ্য লোকমধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভক্তকুলের আদর্শভূত হরিদাসের মৃতদেহ স্বয়ং বহন করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক সমাধি প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই মৃতদেহের পাদোদক নিজের পার্ষদ ব্রাহ্মণকুলগৌরব স্বীয় ভক্তবৃন্দকেও পান করাইয়াছিলেন। বঙ্গীয় বারেন্দ্রশ্রেণী-ব্রাহ্মণকুলাগ্রগণ্য প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য নিজের পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় উপযুক্ত অন্য ব্রাহ্মণ না পাইয়া এই যবন হরিদাসকেই বরণ ও আমন্ত্রণাদি করিয়া শ্রাদ্ধীয় পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন, ইহা কবিকল্পনাও নহে—আরব্যোপন্যাসও নহে, ইহা ঐতিহাসিক জাজ্বল্যমান সত্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণগ্রন্থসমূহে এই সকল কথা স্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সময় এইরূপ শুদ্ধিকার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুজাতির ধর্ম্ম উচ্ছেদ পায় নাই—প্রত্যুত পরমোৎকর্ষই লাভ করিয়াছিল। আজ দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য, সংগঠনের জন্য, জন্মসিদ্ধ অধিকারানুসারে স্বরাজলাভের জন্য, যদি বাঙ্গালী নীচ, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত তথাকথিত হীনজাতিকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ভাগবতী দীক্ষাপ্রদান-পূর্ব্বক তাহাদের সমুন্নতিবিধান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে সনাতন ধর্ম্মের কোন ক্ষতিই হইবে না, প্রত্যুত বাঙ্গালায় সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পরমোৎকর্ষই সাধিত হইবে।

আমার অভিভাষণে আমি স্পষ্টভাবে ইহাই বলিয়াছি যে, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে হিন্দু-সমাজে আচারের পরিবর্ত্তন হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের

সম্মত. মহর্ষি পরাশর তাঁহার ধর্ম্মসংহিতায় এইরূপ পরিবর্ত্তনের ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বয়ংই প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরাশর-ধর্ম্মসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কলিযুগে যথাবিধি বেদাধ্যয়ন হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেদার্থজ্ঞান হইতেছে না; অর্থজ্ঞান না হওয়ায় বেদার্থ-যাগহোমাদিধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে না; ব্রহ্মচর্য্য লুপ্ত হওয়ায় যথাবিধি গার্হস্থ্যের অনুষ্ঠান বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর নহে; যুগপ্রভাবে মানব-সমাজে সত্যের প্রচার ক্রমশঃই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে; কাম ও ক্রোধের অধীন হইয়া মানব নিঃসঙ্কোচে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে; রাগ-দ্বেষ-বিরহিত, সত্যনিরত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল কারণে যথাসম্ভব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া, যুগপ্রভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন আচার-রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। এই পরিবর্ত্তন শাস্ত্রানুমোদিত, এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে ধর্ম্মের আত্যন্তিক বিনাশ হইবার আশঙ্কা অমূলক। মাধবাচার্য্যের এই প্রকার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি আমার অভিভাষণে বর্ত্তমান যুগের অনুকূলভাবে আমাদের আচার-রীতি-নীতির অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তনের কর্ত্তব্যতা সাধারণ সমক্ষে নিবেদন করিরাছি। যথাসম্ভব প্রাচীন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া যুগপ্রভাবে আবির্ভূত, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক একবাক্যে অনুমোদিত অবর্জ্জনীয় আচারগুলিকে সনাতনধর্ম্মের চিরন্তন প্রথানুসারে বিরাট বর্দ্ধনশীল ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজের অনুকূল করিয়া লইয়া সকল বিভিন্নমতাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়কে এক মহান্ উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য হিন্দু-সমাজের নেতৃবর্গকে আমার কাতর প্রার্থনা

জানাইয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সহিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিরোধ নাই—হইতেও পারে না। আমার এই মত অসত্য বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিরাট হিন্দুসমাজ তাহা নির্ণয় করুন। রাগদ্বেষরহিত সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও লোকব্যবহারে নিষ্ণাত, ধীর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া আমি যে শাস্ত্রপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে কি না, তাহা স্থির করুন—ইহাই হইল আমার স্বজাতিহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট বিনীত আবেদন।

আমার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা নিজ কল্পনাবলে শুদ্ধির দ্বারা হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, আর 'ধর্ম্ম গেল', 'বর্ণ গেল', 'আশ্রম গেল', 'সদাচার বিলুপ্ত হইল' বলিয়া প্রবল চীৎকারে বাঙ্গালার আকাশ-পবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি আমার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা ব্যথিত হইয়াছেন, ইহা আমি জানি ; কিন্তু ঐ সকল কথা বলা ছাড়া এখন গত্যন্তর নাই বলিয়াই আমি সেই সকল অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ জনসাধারণের সমক্ষে বাধ্য হইয়া করিয়াছি। আমি চাহি, অনাদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ যেমন হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের দ্বারা স্বজাতির অশেষ প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধান করিয়া আসিতেছেন, এখনও তিনি সেইরূপই করুন। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য করিবার শক্তি এক্ষণে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহার দোষে আজ ভারতের ব্রাহ্মণ্যশক্তি এমন শোচনীয়ভাবে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে? ইহার সত্য উত্তর বর্ত্তমান কালে জাতিমাত্রাভিমানী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত কটু হইবে, তাহা আমি যেমন বুঝি, তাহা আমার প্রতিবাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আমা

অপেক্ষা অধিক বুঝেন, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কিন্তু অপ্রতিবিধেয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে বলিতেই হইতেছে যে, আমরা নিজের দোষে এই অমরদুর্ল্ভ ব্রাহ্মণ্যশক্তি হারাইতে বসিয়াছি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? তাহার নির্ণয়ার্থ প্রবৃত্ত ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারতে কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন—

শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

মহাঃ-শান্তি—মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়।

বাহ্য ও আভ্যন্তর—এই দ্বিবিধ শৌচ ও সদাচারে যিনি সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত, যিনি যজ্ঞশিষ্টভুক্, যাঁহার সেবা ও অকপট ভক্তিতে গুরুজন প্রসন্ন থাকেন, নিত্যব্রতপরায়ণতা যাঁহার স্বভাব, আর যিনি কায়মনোবাক্যে সত্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, অহিংসা, অনৃশংসতা, লজ্জা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং তপস্যা যাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

এই সকল ব্রাহ্মণোচিত গুণ যাহার নাই, সে 'আমি ব্রাহ্মণের পুত্র, সুতরাং ব্রাহ্মণ এবং যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ, সেই হেতু সমাজের শীর্ষস্থানে বসিবার ও সমাজ পরিচালনা করিবার অধিকার আমারই আছে', এই বলিয়া উচ্চ চীৎকারে গগন ফাটাইয়া নেতৃত্বের দাবী করিবে, দলাদলির সৃষ্টি করিয়া সমাজের মধ্যে ঘোর অশান্তির অনল জ্বালাইবে, পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের দোহাই দিয়া আপনার অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও হিংসকতাকে ধর্ম্মরক্ষকতার আবরণে কৌশলের সহিত আবৃত করিয়া, নিজ জীবিকার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিবে, সে দিন এ দেশে আর নাই। ব্রাহ্মণ না

থাকিলে হিন্দুসমাজ মস্তকহীন কবন্ধের দশা প্রাপ্ত হয়—ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাবে আজ হিন্দুসমাজ যে কবন্ধই হইয়া পড়িয়াছে, ইহাও জাজ্বল্যমান ধ্রুব সত্য। যথার্থ ব্রাহ্মণ যদি এক জনও থাকিত, তাহা হইলে তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজ তাহার চরণে মাথা নত করিয়া আপনার অভ্যুদয়ের পথে অপ্রতিহতবেগে অগ্রসর হইতে পারিত, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, করিতে পারেও না। সত্য কথা বলিতে যাহাদের সাহস নাই—ঘরে যাহা করি, বাহিরে তাহারই নিন্দা করিতে যাহাদের রসনা সঙ্কোচবোধ করে না—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেদের অধ্যয়ন যথাবিধি সমাপ্ত না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করে, সে অতি শীঘ্রই সবংশে শূদ্রত্বলাভ করে—এই মনুবচনের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করিবার জন্য তাহারা যদি যথাবিধি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন না করে, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ যে অতি নিকটবর্ত্তী, ইহা এখন বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন। সুতরাং ঐ প্রকৃতির লোক যতই দল বাঁধিবার চেষ্টা করুন না কেন, তাহাতে বাঙ্গালার নবজাগরিত অভ্যুদয়োন্মুখ বিরাট হিন্দুসমাজের কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই। বিবেক, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এবং স্বজাতি ও দেশমাতৃকার অকপট সেবার জন্য অকৈতব সমুৎসাহ—হিন্দুসমাজের ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের অনুকূল গন্তব্যপথের নির্দ্দেশ অতি শীঘ্রই করিয়া দিবে, ইহাই হইল শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। ইহারই অভিব্যক্তি আমার ময়মনসিংহের অভিভাষণে অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



শাস্ত্র-সমস্যা

(১)

সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন ও বলিয়া থাকেন যে, হিন্দু-সমাজের ভিত্তি হইল শাস্ত্র, সমাজের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন শাস্ত্রসম্মত না হইলে তাহা হিন্দুর পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা ভগবদ্গীতা হইতে শ্রীভগবানের বাক্যকেই প্রমাণস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে বাক্যটি এই—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিং সমাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধিলাভ করে না, সে সুখও প্রাপ্ত হয় না এবং পরমা গতিও লাভ করিতে পারে না। এই কারণে কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য আর কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য, এই বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, তুমি শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার অধিকারী।

এই দুইটি বচনের দ্বারা যে কোন ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে হওয়া উচিত, যে কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই বা শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহার অনুষ্ঠান করিলে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, এই কথা বলিয়া যাঁহারা বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজকে শাস্ত্রানুসারে চালাইবার ব্যবস্থা করেন এবং শাস্ত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনের বিরোধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, ভগবদ্গীতাতে যে শাস্ত্র শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে—তাহার দ্বারা কোন্ শাস্ত্রকে বর্ত্তমান সময়ে আমবা গ্রহণ করিব? মহাভারতের যুদ্ধ আনুমানিক তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীনপন্থিগণও একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, আনুমানিক ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল তিন হাজার বৎসর বা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সকল ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রবিধান অনুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

এই শাস্ত্র বলিলে সেই সময়ে ভারতের সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের মধ্যে 'শাস্ত্র' এই নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, ভগবৎ-কথিত এই শাস্ত্র শব্দটি দ্বারা যদি সেই সকল গ্রন্থেরই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মহাভারতের যুদ্ধের পর যে সকল গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহারা 'শাস্ত্র'-পদবাচ্য হয় কি না, তদ্‌বিষয়ে বিচার করা একান্ত আবশ্যক। তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ গ্রন্থ 'শাস্ত্র' বলিয়া অঙ্গীকৃত হইত, তাহারও একটা নির্ণয় হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মতানুসারে চলিতে হইলে বলিতে হয় যে, মহাভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে যে

সকল গ্রন্থ 'শাস্ত্র' নামে ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল, সেই সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা বেদ অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্ত্যভাবে শিক্ষিত ঐতিহাসিকগণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কল্পসূত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলেও প্রাচীনপন্থী পাশ্চাত্ত্যভাবে-অশিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ের নির্ণয় করাও বড় কঠিন ব্যাপার।

তাহার পর আরও দেখিতে হইবে যে—নব্য ঐতিহাসিকগণের মতকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াই, প্রাচীনপন্থিগণের মতানুসারে যদি ইহাও মানিয়া লই যে, ভারত-যুদ্ধের সময় অষ্টাদশ পুরাণরচয়িতা ভগবান্ বেদব্যাস আঠারোখানি পুরাণের মধ্যে কতকগুলি রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই কয়খানি পুরাণ গ্রন্থ তৎকালে 'শাস্ত্র' বলিয়া ভারতে প্রচলিতও হইয়াছিল, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য ইহা হইতেছে যে, সেই কয়খানি পুরাণ, কল্পসূত্র, ধর্ম্মসংহিতা এবং শ্রুতির মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ এই কয়খানি শাস্ত্রগ্রন্থই আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ে প্রমাণস্বরূপ। এখানে ইহাও বিচার্য্য যে, কোন্ পুরাণ মহাভারত রচনার পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না। বেদে পুরাণ নামক সাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বেদব্যাসরচিত পুরাণগুলি যে সে পুরাণ নহে তাহাও স্থির। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত মনুসংহিতা যে মহাভারত রচনার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থানুসারে জীবনযাপনই যদি ভগবানের উপদেশ হয়, তাহা হইলে তদনুসারে আমরা বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের সকল প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছি কি না, এবং এই

কয়খানি গ্রন্থকে প্রমাণরূপে মানিয়া আমরা সকল কার্য্য করিয়া থাকি কি না—এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন।

এই কয়খানি গ্রন্থের উপরে নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান সময়ে আমরা আমাদিগের সকল প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্য করিয়া থাকি, এই-রূপ যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া থাকেন। কারণ, তৎকালপ্রচলিত যে কয়খানি শাস্ত্রগ্রন্থের নাম করা গেল, তাহা-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ যে শ্রুতি অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ গ্রন্থ, সেই শ্রুতিতে বিহিত যে সমুদয় কার্য্য হিন্দুর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সেই সমুদয় কার্য্য যে বর্ত্তমান সময়ে এক শতের মধ্যে নিরানব্বইটিও অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণের কথা ছাড়িয়া দিই। সমাজের নেতৃপদে অভিষিক্ত, জাতি, কর্ম্ম ও আচারের শুদ্ধতার অভিমানে দৃপ্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাই, শ্রুতি-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। শ্রুতিসিদ্ধান্ত অনুসারে চলিতে হইলে ব্রাহ্মণ-বালকের পক্ষে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন অবশ্যই করিতে হইবে। শুধু উপনয়ন হইলেই চলিবে না, উপনয়নের পর সাঙ্গ বেদের অধ্যাপনে কুশল, আচারবান্, তপঃস্বাধ্যায়-নিরত আচার্য্যের গৃহে অন্ততঃ ছয় বর্ষকাল অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যের সহিত ব্রতনিয়মাদি পালন পূর্ব্বক সাঙ্গ সরহস্য বেদের অধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই হইল আমাদিগের মনু প্রভৃতি ধর্ম্মসংহিতাকার মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত। কারণ, মনু বলিতেছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি বেদের অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অবিলম্বে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহাই যদি শাস্ত্রকার ঋষিগণের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান সময়ে কোন্ ব্রাহ্মণসন্তান এইরূপ শূদ্রভাবাপন্ন নহেন? বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ করার নামই উপনয়ন হইয়াছে, কোন উপনীত ব্রাহ্মণ-বালকই এক দিনের জন্যও বেদাধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে বাস করে না, ব্রহ্মচর্য্যপালনের ত কথাই নাই। ব্রত কাহাকে বলে, তাহা জানেই না, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দোবিচিতি নামে প্রসিদ্ধ বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকা নিবন্ধন কোন ব্রাহ্মণ-বালকই উপনীত হইয়াও বেদার্থ-গ্রহণে সমর্থ নহে; সুতরাং বেদের অধ্যয়ন আমাদিগের দেশে বহুশতাব্দী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বেদার্থজ্ঞান লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেদবিহিত কর্ম্ম-সমূহেরও লোপ হইয়াছে। বেদ-বিহিত কর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম হইতেছে—অগ্নিহোত্র। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে একজনও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ব্রাহ্মণের গৃহে শাস্ত্রবিহিতভাবে আহবনীয় গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত হয় নাই, তাহার পক্ষে দর্শপৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত গৃহস্থকর্ত্তব্য কর্ম্মের অধিকার নাই। সুতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বেদবিহিত যাগ করিবার অধিকারী একজন ব্রাহ্মণও নাই, এবং যেরূপ অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান হইলেও এদেশে বর্ত্তমান সময়ে শ্রুতি-বিহিত কর্ম্মসমুহের অনুষ্ঠান কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

গৃহস্থের পক্ষে শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন অসম্ভব হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, এ যুগে আবার শ্রৌত-ব্রাহ্মণ-সমাজ স্থাপিত হইবে এবং বেদের বিধি অনুসারে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান করাইয়া আমরা সনাতনধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব ?

সুতরাং ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রের মধ্যে বেদকে ছাড়িয়া দিয়া কল্পসূত্র, ধর্ম্মসংহিতা ও পুরাণমাত্রকে লইয়া এবং তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান নামতঃ মাত্র করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ চলিতেছে, ইহা সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে,—কল্প-সূত্রগুলিকেই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কি বাস্তবিক চলিতেছে ? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কল্প-সূত্রের বিধি অনুসারে সম্পূর্ণভাবে চলিতেছে না এবং চলিতেও যে পারে না—ইহা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। কল্পসূত্র-সমূহেও যথাবিধি উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নের বিধি আছে। আচার্য্যকুলে থাকিয়া ভিক্ষা-চর্য্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের সহিত ব্রতনিয়মাদি প্রতিপালন পূর্ব্বক সাঙ্গ বেদাধ্য-য়নের বিধি আছে। বর্ত্তমান সময়ের বহু শতাব্দী হইতেই আমাদের দেশে ঐরূপ বিধির যে প্রতিপালন হয় না, তাহা দেখান হইয়াছে। কল্পসূত্রে ও ধর্ম্মসংহিতাসমূহে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা বলা হইয়াছে ; সে পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই—

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দ্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা॥

মনু-সং—৩য় অঃ ৮১ শ্লোঃ।

বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিগণকে অর্চ্চনা করিতে হইবে, হোমের দ্বারা দেবতাদিগকে, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অন্নদ্বারা অন্যান্য প্রাণী-সমূহকে অর্চ্চনা করিতে হইবে।

ইহার পরই মনু বলিয়াছেন,—

কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥
একমপ্যাশয়েদ্বিপ্রং পিত্রর্থে পাঞ্চযজ্ঞিকে।
ন চৈবাত্রাশয়েৎ কঞ্চিৎ বৈশ্বদেবং প্রতি দ্বিজম্॥
বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥

মনু-সং ৩য় অঃ ৮২-৮৫ শ্লোঃ।

অন্ন প্রভৃতির দ্বারা অথবা ফলমূল-দুগ্ধের দ্বারা এবং সামর্থ্য না থাকিলে কেবল জলের দ্বারাও পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে। পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে এই যে পিতৃযজ্ঞ, ইহাতে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইতে হইবে। বৈশ্বদেব কর্ম্মের জন্য কোন বিপ্রকে ভোজন করাইবে না। গৃহ্য অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্বদেবসিদ্ধির জন্য বক্ষ্যমাণ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ হোম করিবে।

আবার মনু বলিতেছেন,—

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄনামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥

• মনু-সং ৩য় অঃ ৭২ শ্লোঃ।

ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ যে গৃহস্থ না করে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে মাত্র, কিন্তু বাঁচিয়া থাকে না অর্থাৎ সে মৃত।

এই শ্লোকের টীকায় মহামহোপাধ্যায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন—"ন জীবতীতি নিন্দয়া অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধ্যতে," অর্থাৎ সে বাঁচিয়া থাকে না, এই নিন্দার দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এই যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ইহা না করিলে প্রত্যবায় হইবে স্থতরাং দীর্ঘকাল না করিলে পাতিত্য হইবে।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান—আমাদিগের দেশের ধর্ম্মের নেতৃত্ব-কামী যে বিদ্বদ্ ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের হাজারের মধ্যে নয়শ'নিরানব্বই জন যে করেন না এবং করিবার সামর্থ্যও যে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের নাই, এ কথা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত শ্রুতি-কটু হইলেও ইহা যে ধ্রুব সত্য, তাহা অস্বীকার করিবে কে?

কল্পসূত্রের মধ্যে বিবাহের যে সকল বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কল্পসূত্রের বিধি অনুসারে আমা-দিগের দেশের দ্বিজাতিগণের মধ্যে যে ব্রাহ্মবিবাহ হইত, তাহাতে যুবতী কন্যারই সম্প্রদান হইত, গৌরীদানের কোন চিহ্নই একখানি কল্প-সূত্রের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোভিল-স্মৃতিতে দেখিতে পাই—ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষার-লবণান্নাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহ শয়ীয়াতাম্, দ্বাদশরাত্রস্বা। ইহার অর্থ—বিবাহ হইবার পর নবপরিণীত পতি ও পত্নী ক্ষারলবণ রহিত অন্ন ভক্ষণ করিবে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিরাত্র ভূমিতে (অর্থাৎ খট্টা প্রভৃতির উপর নহে) একত্র শয়ন করিবে। অথবা দ্বাদশ রাত্র এই ভাবে থাকিবে। তাহার পর সঙ্গত হইবে।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥

অর্থাৎ আট বৎসরবয়স্কা কন্যাকে গৌরী বলা যায়, নবমবর্ষীয়া কন্যার নাম রোহিণী, দশমবর্ষীয়া কন্যার নাম কন্যকা, দশম বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কন্যাকে রজস্বলা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ রজস্বলা কন্যা দান করিলে পিতৃলোক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এই ভাবের পৌরাণিক বা স্মার্ত্ত বচন ভারতযুদ্ধের সময় এ দেশে প্রচলিত ছিল না এবং তদনুসারে অপ্রাপ্তরজস্কা দশমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইত না, ইহা স্থির। কারণ, শ্রুতি, কল্পসূত্র এবং মহাভারতের মধ্যে এরূপ একটি প্রমাণও বিদ্যমান নাই, যাহা দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহাভারত-রচনার সময় এবং তাহার পূর্ব্বে সনাতন হিন্দুসমাজে অপ্রাপ্তযৌবনা কোনও কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল।

এই সকল ব্যবস্থা অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যাদান করিতে হইবে, না করিলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হইবেন—এইরূপ ব্যবস্থা পরবর্ত্তিকালে যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা স্থির। কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, দেবকী প্রভৃতি ত্রিজগন্মান্যা আর্য্য-ললনাগণের বিবাহ যে যৌবনাবস্থায় হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের ঐরূপ বিবাহ যে তৎকালে অনুচিত বলিয়া ঋষিজন-পরিশাসিত হিন্দুসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন প্রমাণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পুরাণের মধ্যেই যেমন বালিকা-বিবাহের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, আবার সেই পুরাণসমূহের মধ্যে শত শত যুবতী-বিবাহের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে, যুবতীবিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরোধী শাস্ত্র কেন দেশের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কেনই বা দেশের আস্তিক সম্প্রদায় শ্রুতি, কল্পসূত্র এবং মহাভারত প্রভৃতির অনুমোদিত রজস্বলা কন্যার বিবাহকে এত গর্হিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবতীবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ, অথচ

আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই বলিয়া থাকি, যুবতী কন্যার বিবাহে পিতৃকুল নরকস্থ হয়। ইহার মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহার নিরূপণ করিবার জন্য ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করিতে যদি কেহ প্রবৃত্ত হয়, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ তাদৃশ ব্যক্তিকে নাস্তিক, বিপ্লাবক ও ধর্ম্মদ্রোহী বলিতে অণুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। শাস্ত্র যে লোকরক্ষার জন্য, তাহা তাঁহারা মানেন না। লোকস্থিতির জন্য কালভেদে শাস্ত্র ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যদি হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে এখনও শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে—এই জাজ্বল্যমান সত্যের উপেক্ষা করিয়া, তথাকথিত প্রাচীন শাস্ত্রানুসারেই আমরা চলিব; যাহারা সেইরূপ প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে চলিবে না, তাহাদিগকে আমরা হিন্দুসমাজ হইতে বহিস্কৃত করিব—এইরূপ ভ্রান্তি ও অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করিবার দিন হিন্দুসমাজের সৌভাগ্যবশতঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এখন শাস্ত্র বলিলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রিগণ নিবন্ধকারগণের রচিত বাক্যাবলীকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতিহাস সুস্পষ্ট অক্ষরে বলিয়া দিতেছে—ঐ সকল নিবন্ধকার কেহই খৃষ্টীয় একাদশ বা দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কেহই আর্ষজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহারা যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যে সকল সামাজিক নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং যে সকল সামাজিক নিয়ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল, তাহাদিগকেই শাস্ত্রীয় বলিয়া সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা নিজের যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্য দেশের বা অন্য সমাজের প্রচলিত নিবন্ধকারগণের প্রদর্শিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহারা অণুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

এরূপ অবস্থায় কোন্ নিবন্ধকারের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন

করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ নিজের গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লইবে? এই সকল বিষয়ের অপক্ষপাত বিচার দ্বারা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক।

আরও দ্রষ্টব্য এই যে, প্রামাণিক সকল নিবন্ধকারই নিজ নিজ গ্রন্থে কলিবর্জ্জ্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধের পর হিন্দুসমাজ সেই সময়ে ও তাহার পূর্ব্বকালে প্রচলিত ঋষি-বচন অমান্য করিয়া কতকগুলি নূতন আচার পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই সকল ধর্ম্মকেই সকল নিবন্ধকার কলিবর্জ্জ্য ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই কলিবর্জ্জ্য ধর্ম্মের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—অশ্বমেধ, গো-মেধ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, শূদ্র কর্ত্তৃক পক্ক অন্নের গ্রহণ, অতিদূর তীর্থযাত্রা প্রভৃতি।

পূর্ব্ব-পুরুষগণের আচরিত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবিহিত এই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও আচারকে কেন পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, ইহার সমর্থনে সকল নিবন্ধকারই একটি পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কার্য্যাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ॥

অর্থাৎ লোকগুপ্তির জন্য—হিন্দুসমাজের রক্ষার জন্য—কলির প্রথমাবস্থায় বুধগণ মিলিত হইয়া এই সমুদয় ধর্ম্মকার্য্যের নিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, সমাজের ভাবী ধ্বংসের পথকে রুদ্ধ করিতে হইলে, মহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে নিবন্ধগ্রন্থসম্মত প্রাচীন আচার সমূহকে সময়োপযোগিভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিবার ভার সমাজ-হিতৈষী সমাজ-নেতৃবর্গেরই উপর ন্যস্ত

হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের ব্যবস্থাকেই শ্রুতিবিহিত ব্যবস্থার ন্যায় সমাজের সকল লোককে মানিয়া লইতে হয়।

ইহাই বুঝাইবার জন্য সকল প্রামাণিক নিবন্ধকারই উক্ত পুরাণের বচনটীর শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ।

অর্থাৎ সাধুগণের প্রবর্ত্তিত আচার বেদেরই ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে। সাধু কাহাকে বলে, তাহার উত্তর দিতে যাইয়া ভাগবতকার মহর্ষি বেদব্যাস কি বলিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

ইহার অর্থ—যাঁহারা তিতিক্ষু অর্থাৎ ক্ষমাশীল, যাঁহারা কারুণিক, যাঁহারা সকল দেহীরই সুহৃদ্ অর্থাৎ হিতৈষী—রাগদ্বেষ-মূলক ব্যবহার না থাকা নিবন্ধন যাঁহাদিগের উপর কেহ বিদ্বেষযুক্ত নহে, যাঁহারা শমনিরত বা শান্তপ্রকৃতি, তাঁহারাই সাধু। তাঁহারাই সাধুকুলের ভূষণ। এইরূপ সাধুব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ অবনতির পথ রুদ্ধ করিবার জন্য এবং সমগ্র সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়-সাধনের জন্য যে সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবেন, তাহাই হইতেছে—হিন্দুর শাস্ত্র। এই শাস্ত্র যুগভেদে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সমাজের পরিবর্ত্তন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহাই হইল হিন্দুর শাস্ত্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত। ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা মুখে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া জিদের বশে আপনার মত চালাইবার জন্য দেশের মধ্যে দলাদলি, কলহ ও সর্ব্বনাশকর বিদ্বেষের বহ্নি জ্বালাইয়া থাকেন, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করে না বা করিতেও পারে না, ইহা স্থির।

* * *

(২)

সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে শাস্ত্রব্যবসায়ী, প্রাচীন আচারসমূহের ঐকান্তিক পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ, অন্য দিকে নব্যভাবে শিক্ষিত, নূতন করিয়া সমাজ গড়িবার জন্য প্রস্তুত সংস্কারকদল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, মনু প্রভৃতি ঋষিগণের রচনাবলীর উপরই ঐকান্তিক নির্ভর করিতে হইবে। কারণ তাঁহারা ছিলেন সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহারা ছিলেন অভ্রান্ত; সুতরাং তাঁহাদিগেরই সংহিতাগ্রন্থ হইতে ধর্ম্মের যে স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহারই নাম সনাতন ধর্ম্ম।

প্রাচীনপন্থীদিগের এইরূপ মত গ্রহণ করিতে হইলে ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতারই উপর নির্ভর করিতে হয়। ঋষিদিগের সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রে ঐকমত্য নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কি লিখিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং—

এই সূত্রটির অর্থ এই যে, সেই ঈশ্বরেই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া কোন জীবই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও যে সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, তাহা যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বিশ্বাস করিতেন না।

মীমাংসাদর্শনের প্রধানতম আচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বীয় শ্লোকবার্ত্তিক-নামক গ্রন্থে বেদের প্রামাণ্য-বিচার প্রসঙ্গে, কোন মনুষ্যেরই যে সর্ব্বজ্ঞতা

হইতে পারে না, তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই মনুষ্যমাত্রের অসর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে মীমাংসক আচার্য্যগণের কি সিদ্ধান্ত, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সেই জন্য অগ্রে সেই বিষয়েরই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। সমগ্র বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্র-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য যে সকল ধর্ম্মাচার্য্য নানাপ্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহর্ষি-জৈমিনি-প্রদর্শিত বেদ-ব্যাখ্যার নিয়মাবলী অকুণ্ঠিত-চিত্তে ও ঐকমত্যসহকারে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে মহর্ষি জৈমিনি-প্রদশিত নিয়মাবলীর অনুসরণ করিতে হয়। জৈমিনির মতানুসারে না চলিয়া যাঁহারা প্রকারান্তরের আশ্রয় ধরিয়া থাকেন, সনাতন হিন্দুসমাজের আচার্য্যগণ একবাক্যে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা আমাদিগের দেশের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন ও বেদব্যাখ্যা বিষয়ে জৈমিনি-প্রদশিত মীমাংসাপদ্ধতিকে অসঙ্কুচিতচিত্তে মানিয়া থাকেন।

জৈমিনির মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। কেন বেদ স্বতঃপ্রমাণ—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া মহর্ষি জৈমিনি. জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী এবং সেই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ একবাক্যে ইহাই বলিয়া থাকেন যে, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মনুষ্যের দ্বারা রচিত হয় নাই, এই কারণে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। মীমাংসকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্তের মূলে কি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অগ্রে বুঝা আবশ্যক এবং তাহা বুঝিতে হইলে স্বতঃপ্রমাণ কাহাকে বলে, তাহাই বুঝিতে হইবে।

প্রমা শব্দের অর্থ—যথার্থ জ্ঞান। যে জ্ঞানের কোন অংশেই ভ্রান্তি নাই, তাহার নাম প্রমা। প্রমা ও প্রমাণ এই দুইটি শব্দই অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদিগের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ কি না, তাহা বুঝিতে হইলে সেই জ্ঞান যে কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যদি দুষ্ট হয়, তবে সেই দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্তি, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, ইহাই হইল নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত।

মীমাংসকগণ বলেন যে, দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে—এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সহিত আমাদিগের মতভেদ না থাকিলেও জ্ঞানের যে যথার্থরূপতা, তাহা জানিবার উপায় কি, এই বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, আমাদিগের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই সময় সেই উৎপন্ন জ্ঞান যথার্থজ্ঞান বা ভ্রান্তি, তাহা আমরা বুঝি না, জ্ঞানের স্বভাববশতঃ বিষয় প্রকাশ হয়, এই মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞান যে যথার্থ অথবা তাহা ভ্রান্তি, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয় যে, ঐ জ্ঞান দুষ্ট বা অদুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আমরা দেখি যে, উহা অদুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন আমরা ঐ জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান বলিয়া বুঝি, আর যখন আমরা ঐ জ্ঞান দুষ্টকারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বুঝি, তখন আমরা স্থির করি যে, ঐ জ্ঞান যথার্থ নহে, উহা ভ্রান্তি। নৈয়ায়িকগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিসহ নহে, কারণ, জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রামাণ্য যদি আমাদিগের জ্ঞাত না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানপ্রামাণ্যের নির্ণয় হওয়া একপ্রকার অসম্ভবই হইয়া

উঠে। অর্থাৎ এরূপ মত অবলম্বন করিলে আমাদিগকে একপ্রকার অনবস্থারূপ দোষের মধ্যে পতিত হইতে হয়। কেন, তাহা বলি।

কোন একটি জ্ঞানের যথার্থতা জানিবার জন্য তাহার কারণ দুষ্ট কি না, এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যখন সেই জ্ঞানের কারণকে অদুষ্ট বলিয়া বোধ করি, তখন সেই অদুষ্ট-কারণবিষয়ক যে আমাদের জ্ঞান, তাহা যথার্থ কি না, তাহাও বুঝিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে হয়। অর্থাৎ উৎপন্ন জ্ঞানের এই কারণটি দুষ্ট নহে, এই প্রকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা প্রথমজ্ঞানের প্রামাণ্যে বিশ্বাস স্থাপন করি। কিন্তু 'ইহা অদুষ্ট কারণজন্য নহে', এইরূপ যে আমার দ্বিতীয় জ্ঞান, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা আমি তখন বুঝি না। এই দ্বিতীয় জ্ঞান যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের প্রামাণ্যও ভাসিয়া যায়; সুতরাং বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্য আমাকে সেই দ্বিতীয় জ্ঞানটি কোন প্রকার দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে। সেই অনুসন্ধানের ফলে আমার যে তৃতীয় জ্ঞানটি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় জ্ঞানটি দুষ্টকারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এই প্রকার যে জ্ঞান হইবে, সেই জ্ঞানে অর্থাৎ তৃতীয় জ্ঞানে প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা যদি আমি স্থির না করিতে পারি, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্যের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না। এই ভাবে উত্তরোত্তর কারণপরীক্ষার ফলে যত জ্ঞানই আমার উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক জ্ঞানটির প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে গেলে আমাকে অলঙ্ঘনীয় অনবস্থারূপ দোষের মধ্যে পতিত হইতে হয়। ফলতঃ কোন জ্ঞানেরই প্রামাণ্য আমাদের জীবন-কালের মধ্যে নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই কারণে জ্ঞানের প্রামাণ্য আর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই বুঝিতে

হয়—এইরূপ যে মত, তাহা যুক্তিসহ নহে, এইরূপ ভ্রান্তমতকেই মীমাংসকগণ পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই পরতঃ-প্রামাণ্যবাদের উপর নির্ভর করিলে আমাদিগের কোনরূপ ব্যবহারই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই কারণে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য বুঝিতে হইলে সেই জ্ঞানব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। মানুষের জ্ঞান হইবামাত্রই সেই জ্ঞানের যথার্থতাবোধ আপনা আপনি হইয়া থাকে, ইহাই হইল মানবের জ্ঞানের স্বভাব। ইহারই নাম স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ। জ্ঞান যে স্বভাব অনুসারে নিজের বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই স্বভাব অনুসারেই সে নিজের স্বরূপকেও প্রকাশ করে এবং নিজের উপর যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও সেই স্বভাব অনুসারেই প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই হইল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। অর্থাৎ প্রকাশরূপ জ্ঞান একসঙ্গে ত্রিবিধ বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সে ঘটপটাদি বিষয়কে প্রকাশ করে, আপনাকে প্রকাশ করে, এবং আত্মগত যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও প্রকাশ করে। ইহার নাম জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ।

মীমাংসকগণের মধ্যে প্রাভাকর নামে প্রসিদ্ধ যে দার্শনিকগণ তাঁহারা এইরূপ স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। মীমাংসকগণের মধ্যে আর একটী মত প্রচলিত আছে। সেই মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য কিন্তু জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই মতে জ্ঞান বিষয়কেই প্রকাশ করে, আপনাকে প্রকাশ করে না, সুতরাং তাহা স্বগত প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে না। সেই বিষয়-প্রকাশক জ্ঞানের প্রকাশ অন্য একটী জ্ঞানের দ্বারা হয়—সেই অন্য জ্ঞানটী নিজের বিষয়স্বরূপ প্রথম জ্ঞানকে যেমন প্রকাশ করে, তেমনিই সেই প্রথম জ্ঞানগত যে প্রামাণ্য,তাহাকেও প্রকাশ করে।

সুতরাং এই মতে প্রামাণ্যের আশ্রয়স্বরূপ জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রকাশক হয়। পূর্ব্বজ্ঞানের প্রামাণ্য আছে কি না এইরূপ অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই তাহার প্রামাণ্য প্রকাশিত হয়—ইহাই হইল ভট্টমতের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ। ভগবান্ বেদব্যাস, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি বৈদান্তিক দার্শনিকগণও প্রভাকর-মতসিদ্ধ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহর্ষি কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণও এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মানিয়া লইয়াছেন।

এই দ্বিবিধ স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর এক্ষণে এইরূপ একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে—এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানপ্রকাশ যদি জ্ঞানগত যথার্থতাকে প্রকাশ করে, এবং ইহাই যদি জ্ঞানপ্রকাশের স্বভাব হয়, তাহা হইলে শুক্তিতে যে আমাদের রজতভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহার প্রকাশও যেহেতু জ্ঞানপ্রকাশ, সেই হেতু তাহাও জ্ঞানগত যথার্থতাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদীকে অঙ্গীকার করিতেই হইবে। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, আমাদিগের জ্ঞানকে আমরা ভ্রান্তি বলিয়া বুঝি কি প্রকারে? সকল জ্ঞানই যে যথার্থ, তাহা ত সম্ভবপর নহে, 'ভ্রান্তি' বা অযথার্থ জ্ঞান বুঝিবার উপায় কি, তাহা স্বতঃ প্রামাণ্যবাদিগণের মতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করিতে যাইয়া স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবপ্রকৃতি অনুসারে মানুষ জ্ঞানমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে, ইহা সত্য, কিন্তু সেই প্রকার বুঝার পর যদি তাহার সেই উৎপন্ন জ্ঞান দুষ্ট কারণ হইতে হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বজাত জ্ঞানে অবগত যে প্রামাণ্য, তাহাকে সে পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ হইলেই সেই প্রকাশিত জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া বুঝা আমাদিগের স্বভাব, কিন্তু সেই প্রকার বোধ হইবার পরে যদি আমাদিগের সেই জ্ঞানের কারণকে দুষ্ট বলিয়া বুঝিবার হেতু উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা তখনই সেই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হইয়া থাকি।

এখন দেখিতে হইবে যে জ্ঞানের কিরূপ কারণে দোষদর্শন হইলে আমরা জ্ঞানের অপ্রামাণ্য নির্ণয় করিয়া থাকি। প্রথমতঃ জ্ঞানকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দ। বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ বিশেষ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ছয় প্রকার হইয়া থাকে;—চাক্ষুষ, রাসন, ত্বাচ, ঘ্রাণজ, শ্রোত্রজ ও মানস। রূপের সহিত নয়নের সন্নিকর্ষ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ' বলা যায়। রসনেন্দ্রিয়ের সহিত মধুরাদিরসের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'রাসন প্রত্যক্ষ।' ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত কোমল, কঠিন অথবা উষ্ণ বা শীত-স্পর্শের সহিত সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'ত্বাচ প্রত্যক্ষ' কহে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সুরভি বা অসুরভি গন্ধের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ'। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শ্রোত্রজ বা 'শ্রাবণ প্রত্যক্ষ' বলা যায়। এইরূপ মনের সহিত সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'মানস প্রত্যক্ষ'। এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের করণস্বরূপ যে চক্ষু প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং মনোরূপ যে অন্তরিন্দ্রিয়, তাহাতে দৌর্ব্বল্য বা কাচ-কামলাদি নামে প্রসিদ্ধ দোষ যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহার প্রামাণ্য-জ্ঞান প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গে প্রতীত হইলেও পরে অপনোদিত হয় অর্থাৎ নিরাকৃত হয়। এইরূপ হইলেই আমরা এই সকল দুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের ভ্রান্তিরূপতা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। অনুমিতিরূপ যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু তাহা পরোক্ষজ্ঞান। এইরূপ কোন প্রকার বাক্য শ্রবণ করিলে আমাদিগের সেই বাক্যের অর্থবিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে শাব্দ জ্ঞান কহে। সেই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু তাহা পরোক্ষ। পর্ব্বতে দূর হইতে ধূমদর্শন করিয়া সেই ধূম বহ্নিব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, এইরূপ জ্ঞান যদি আমাদিগের হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে আমরা ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিয়া থাকি। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়ার পর আমাদিগের সেই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এইরূপ যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে আমরা অনুমিতি বলিয়া থাকি।

যে হেতুর উপর এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, প্রকৃত-পক্ষে সেই হেতুতে যদি সেইরূপ ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হয়। এইরূপ ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে যে অনু-মিতি হয়, তাহাকেও আমরা অপ্রমাণ বলিয়া পরে বুঝিয়া থাকি। এইরূপ শাব্দবোধের কারণস্বরূপ যে শব্দ, তাহা স্বতোদুষ্ট না হইলেও, সেই শব্দের উচ্চারণকারী পুরুষে যদি ভ্রম, প্রমাদ, চক্ষুরাদি করণের অপটুতা অথবা রাগদ্বেষাদিবশতঃ লোককে ভুল বুঝাইবার ইচ্ছা, এই চারি প্রকার দোষের মধ্যে কোন একটা দোষ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই পুরুষের উচ্চারিত বাক্য হইতে যে জ্ঞান বা শাব্দবোধ হইয়া থাকে, সেই শাব্দবোধকে আমরা পরে অপ্রমাণ বা ভ্রান্তি বলিয়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হই।

এক্ষণে প্রকৃত প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে। মীমাংসকগণ

জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য মানিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহাকে যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই আমরা বুঝিয়া থাকি। এই নিয়ম অনুসারে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গকাম পুরুষ দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের অনুষ্ঠান করিবে)—এই শ্রুতিবাক্য হইতে আমাদিগের এইরূপ বোধ হইয়া থাকে যে, দর্শপূর্ণমাস নামে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে যাগ, তাহা হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হয়। এইরূপ যে বোধ, তাহা শাব্দবোধ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শাব্দ-বোধটি যখনই আমাদের উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞানের স্বভাবানুসারে ইহা যে যথার্থবোধ, তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। পরে এই বোধটি যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে যদি আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা এই শাব্দবোধের কারণস্বরূপ যে শ্রুতিবাক্য তাহাতে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হই। শ্রুতিবাক্য যেহেতুক শব্দস্বরূপ, এই কারণে স্বতঃ তাহাতে কোন দোষের সম্পর্ক নাই, তবে তাহার কর্ত্তা বা রচয়িতা যদি পূর্ব্বোল্লিখিত দোষচতুষ্টয়ের অর্থাৎ ভ্রান্তি, প্রমাদ, করণের অপটুতা ও পরপ্রতারণেচ্ছা এই চতুর্ব্বিধ দোষের কোন একটি দোষযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমরা এ স্থলে উক্ত শ্রুতি-বাক্য হইতে উৎপন্ন যে শাব্দবোধ, তাহার ভ্রমরূপতা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারি। মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতিবাক্যসমূহ আমা-দিগের মধ্যে অধ্যাপক-পরম্পরায় অনাদিকাল হইতে উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। তোমার বা আমার ন্যায় কোন মানব এইরূপ বাক্য যে প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্য্যন্ত আমরা পাই না।

তাহার পর দেখ, কোন শাব্দবোধকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিবার আর একটি কারণ আছে। সে কারণের নাম হইল "বাধনিশ্চয়"। অর্থাৎ শ্রুতিতে

যাহা বলিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি আমাদিগের লোকসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা বাধিত, এরূপ জ্ঞান আমাদিগের যদি থাকে, তাহা হইলেও আমরা সেই শ্রুতিবাক্য হইতে উৎপন্ন যে বোধ, তাহার ভ্রমরূপতা নির্ণয় করিতে বাধ্য হইতে পারি। কিন্তু প্রকৃতস্থলে এরূপ বাধ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। দর্শপূর্ণমাস যাগ করিলে যে স্বর্গরূপ সুখ উৎপন্ন হয় বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই স্বর্গরূপ সুখ আমাদিগের এই জীবনে অনুভবযোগ্য কোন পার্থিব সুখ নহে। তাহা এই বর্ত্তমান-দেহপাতের পর লোকান্তরে অন্য কোন প্রকার দেহের সহিত সম্বন্ধ হইলেই অনুভূত হয়। সুতরাং সেই লোকান্তরের সুখ আছে কি নাই, ইহা আমরা আমাদিগের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা তন্মূলক অনুমানাদির সাহায্যে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের প্রত্যক্ষ লৌকিক বস্তুকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, অলৌকিক বস্তু গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহাতে নাই। আর এইরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষমূলক যে সমস্ত অনুমান, তাহার সাহায্যেও আমরা লৌকিক বস্তুরই বোধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। স্বর্গসুখ যখন লৌকিক নহে, তখন তাহার সত্তা লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে তাহার বাধনিশ্চয় হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, যে বস্তু প্রত্যক্ষের যোগ্য, তাহারই অভাব আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ হই। যাহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এরূপ বস্তুর অভাব আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না, ইহাই হইল লোকসিদ্ধ নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে স্বর্গ যে হইতে পারে না বা অসম্ভব বস্তু, ইহা আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। প্রত্যক্ষ যাহার উপজীব্য, এরূপ অনুমানও আমাদিগের নিকট স্বর্গের সত্তাকে বুঝাইতে পারে না এবং স্বর্গের অভাবকেও বুঝাইতে পারে না— ইহা স্থির। অথচ শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা দর্শপূর্ণমাস যাগ করিলে স্বর্গ

হইতে পারে, এইরূপ যে অর্থ, তাহা আমরা বুঝিয়া থাকি। এইরূপ বোধ যে ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা বলিতে সমর্থ নহি, কারণ, ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত বাক্য পুরুষেরই হইতে পারে—ইহা সত্য হইলেও, শ্রুতির নির্ম্মাতা কোন পুরুষের সন্ধান যখন আমরা পাই না, কোন্ দিন শ্রুতিবাক্য কোন্ পুরুষের দ্বারা জগতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, তাহারও নির্ণয় করিবার সামর্থ্য যেহেতু আমাদিগের বিদ্যমান নাই, তখন এইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য হইতে যে জ্ঞান আমাদিগের উৎপন্ন হইয়া থকে, সে জ্ঞান যে ভ্রমাত্মক জ্ঞান, তাহা আমরা কিছুতেই নির্ণয় করিতে সমর্থ নহি। এই কারণে জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য-নিয়মানুসারে শ্রুতিবাক্যজনিত জ্ঞানের প্রামাণ্য অপনোদিত হয় না, সুতরাং তাহার যে স্বতঃ প্রামাণ্য, তাহা আমরা অঙ্গীকার করিতে বাধ্য। ইহাই হইল মীমাংসক আচার্য্যগণের শ্রুতির স্বতঃ প্রমাণ্য বিষয়ে প্রধান যুক্তি।

এই যুক্তির উপরই নির্ভর করিয়া জৈমিনি, শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ শ্রুতিপ্রামাণ্যের ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের দেশের আস্তিক সম্প্রদায়ও এই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বেদবাক্যজনিত বোধের অভ্রান্তত্ব মানিয়া লইয়াছেন ও শ্রুতিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। ইহা আস্তিক সম্প্রদায়ের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিনিচয় এইরূপ যুক্তির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন কি না, তাহা এস্থলে নির্ণয় করিতে চাহি না। কিন্তু বেদের প্রামাণ্যবিষয়ে আস্তিক ধর্ম্মাচার্য্যগণের এইরূপ বিশ্বাস যে সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতে দৃঢ় হইয়া আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

* * *

(৬)

সনাতন ধর্ম্মের মূল প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদ, বেদ-ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহাই হইল মীমাংসকাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বেদের সাহায্যেই মানব ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে পারে, অন্যথা নহে, ইহাই প্রতিপাদন করিতে যাইয়া মীমাংসক আচার্য্যগণ মানবের সর্ব্বজ্ঞতা কখনই সম্ভবপর নহে—ইহা বুঝাইবার জন্য যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন—এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিতেছেন—"যত্তু লৌকিকং বচনং তচ্চেৎ প্রত্যয়িতাৎ পুরুষাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ং বা অবিতথমেব তৎ। অথাপ্রত্যয়িতাৎ পুরুষাৎ অনিন্দ্রিয়বিষয়ং বা তাবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রভবমপ্রমাণম্। অশক্যং হি তৎ পুরুষেণ জ্ঞাতুং ঋতে বচনাৎ। অপরস্মাৎ পৌরুষেয়াদ্ বচনাৎ তদবগতিরিতি চেৎ তদপি তেনৈব তুল্যম্। নৈবংজাতীয়কেষু অর্থেষু পুরুষবচনং প্রামাণ্যমুপৈতি, জাত্যন্ধানামিব বচনং রূপবিশেষেষু। ন চ বিদুষামুপদেশো নাবকল্পতে, উপদিষ্টবন্তশ্চ মন্বাদয়ঃ, তস্মাৎ পুরুষাঃ সন্তো বিদিতবন্তশ্চ। যথা চক্ষুষা রূপমুপলভ্যতে ইতি দর্শনাদেবাবগম্যতে। উচ্যতে উপদেশা হি ব্যামোহাদপি ভবন্তি। অসতি ব্যামোহে বেদাদপি ভবন্তি। অপি চ পৌরুষেয়াদ্বচনাৎ এবময়ং পুরুষো বেদ ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ নৈবময়মর্থ ইতি।" ইহার অর্থ—

যাহা কিন্তু লৌকিক বচন, তাহার উচ্চারয়িতা মানব যদি শ্রদ্ধেয় হয়েন, অথবা সেই বচনের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহা যদি ইন্দ্রিয়বেদ্য হয়, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ হইয়া থাকে, আর সেই মানব

যদি শ্রদ্ধেয় না হয়, কিংবা তাহার সেই বচনের অর্থ যদি ইন্দ্রিয়বেদ্য না হয়, তাহা হইলে তাহা পুরুষবুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া অপ্রমাণই হয়। কারণ তাহা সেই পুরুষ জানিতে পারে না, যদি প্রমাণ বচন সে পাইয়া থাকে, তবেই তাহা সে জানিতে পারে, অন্যথা নহে। অন্য কোন পুরুষের বচন দ্বারা সে জানিতে পারিয়াছে, এইরূপ কল্পনাও যুক্তিসহ নহে। কারণ, এই প্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ে পুরুষের বচন কিছুতেই প্রমাণ হইতে পারে না—যেমন যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহার বচন রূপবিশেষের প্রমাণ হয় না। প্রকৃত স্থলেও সেইরূপই হয়। (এখন যদি বল) পণ্ডিতগণ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ করেন না, তাহা ত নহে, মনুপ্রভৃতি বিদ্বদ্‌গণ ত উপদেশ করিয়াছেন। যেমন চক্ষুদ্বারা রূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারে, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপই হইবে। এই শঙ্কার উত্তর এই যে, মানবের উপদেশ ব্যামোহ হইতেও হইয়া থাকে, যদি ব্যামোহ না থাকে, তবে এইরূপ অলৌকিক বিষয়ের উপদেশ বেদ হইতেও হইয়া থাকে। আরও একটি কথা এই যে, কোন পুরুষের বাক্য শুনিলে 'এই পুরুষ এই প্রকার বুঝিয়াছে' এইরূপ জ্ঞানই লোকের হয়। 'এইরূপ বস্তুই সত্য' এইরূপ জ্ঞান কিন্তু হয় না।

মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামীর এই প্রকার উক্তির দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মীমাংসকগণ ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণে কোন মনুষ্যের বচনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না, বেদে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। মানুষ কখনই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। ইহাই হইল মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন—

সর্ব্বজ্ঞোঽসাবিতি হ্যেব তৎকালে তু বুভুৎসুভিঃ।
তজ্‌জ্ঞানজ্ঞেয়বিজ্ঞানরহিতৈর্গম্যতে কথম্‌ ॥ ১৩৪।
কল্পনীয়াশ্চ সর্ব্বজ্ঞা ভবেয়ুর্বহবস্তব।
য এব স্যাদসর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্বজ্ঞং ন বুধ্যতে ॥ ১৩৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽনববুদ্ধশ্চ যেনৈব স্যান্ন তং প্রতি।
তদ্বাক্যানাং প্রমাণত্বং মূলাজ্ঞানেঽন্যবাক্যবৎ ॥ ১৩৬ ॥

(শ্লোকবার্ত্তিক)

এই কয়টি শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—"কোন্ মানুষ সর্ব্বজ্ঞ—ইহা সেই মানুষ যখন বিদ্যমান থাকে, তৎকালে লোক কি প্রকারে বুঝিবে? যাহারা তাহার সর্ব্বজ্ঞতা বুঝিতে চাহে, এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহার সাহায্যে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, যাহারা সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহারা যাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অনুমান করিবে, তাহার সেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান কি-স্বরূপ, এবং সেই জ্ঞানের বিষয় যে কোন্ কোন্ বস্তু, তাহা তাহারা নিজেই বুঝে না, এইরূপ ব্যক্তিগণ অপরের সর্ব্বজ্ঞতাবিষয়ক অনুমান কোন্ হেতুর সাহায্যে করিতে পারে? সর্ব্বজ্ঞতারূপ সাধ্যের সাধক কোন হেতুই অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, কারণ, যে ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করিবে, তাহারও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাহাই যদি মানুষের সর্ব্বজ্ঞতাবাদিগণের ইষ্ট হয়, তাহা হইলে অঙ্গীকার করিতে হয় যে, এ সংসারে সর্ব্বজ্ঞ এক জন নহেন, যাঁহারা অপরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বুঝেন তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞ। অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কখনই সর্ব্বজ্ঞের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যাহার সর্ব্বজ্ঞতা অনুভব করিতে পারে না, সে ব্যক্তি তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, এবং সেই কারণে ঐরূপ কল্পিত সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অলৌকিক বিষয়ে যাহা কিছু

বলিয়া থাকেন, তাহার কোন মূল প্রমাণ না থাকায়, সেই সকল বচনের উপর প্রামাণ্য-বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব।"

এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে—মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকে বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা নিরাকরণার্থ ইহা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে যে যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তদনুসারে সকল মানবেরই সর্ব্বজ্ঞতা নিরাকৃত হইতেছে ; মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা আছে ইহা কোন স্থানেই কুমারিল ভট্ট বলেন নাই। মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণের ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব যে তাঁহাদের বেদার্থ-জ্ঞানমূলক, তাহা তিনি বহুস্থলে স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রও তাহাই করিয়া থাকে—

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে।
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥

অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ তাহা প্রমাণ নহে, বেদার্থের উপনিবন্ধ করিয়াছেন বলিয়া, মনুর স্মৃতিই স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান বলিয়া গৃহীত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে—শুধু বর্ত্তমান সময়েই বা কেন, প্রায় হাজার বৎসর হইতে—ভারতে আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক ঋষি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি কখনই সম্ভবপর নহে। এইরূপ বিশ্বাস যে মীমাংসাশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, তাহা উল্লিখিত শবরস্বামীর ভাষ্য ও মীমাংসাবার্ত্তিক দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে।

পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না।—ইহাই হইল হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনের সিদ্ধান্ত। পারলৌকিক বস্তুনিচয়ের যথার্থ জ্ঞান বেদ হইতেই হয়, অন্য কোন বেদ-নিরপেক্ষ প্রমাণ হইতে

হয় না—সুতরাং মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের ও যে অতীন্দ্রিয় বস্তুবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান, তাহা বেদের সাহায্যেই লব্ধ—ইহাই হইল মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী ও বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টের মত—ইহা পুর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর ও একমাত্র পরমেশ্বরকেই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি শারীরকভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

মহত ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য শাস্ত্রস্য অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্‌বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি—শারীরক সূত্র ১।১।৩।

শিক্ষাকল্প-ব্যাকরণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বিদ্যাস্থান দ্বারা পরিপুষ্ট, প্রদীপের ন্যায় সকল পদার্থের অবদ্যোতক, সর্ব্বজ্ঞকল্প ঈদৃশ ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ ব্রহ্মই হয়েন, কারণ সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিত ঈদৃশ ঋগবেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বিশেষ ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতে হইতে পারেনা। আচার্য্য শঙ্করের এই প্রকার উক্তিদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, সর্ব্বার্থাবদ্যোতক শাস্ত্রের নির্ম্মাণরূপ হেতু দ্বারাই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব অনুমিত হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্বের সাধক যে হেতু, তাহা একমাত্র ব্রহ্মেতেই আছে বলিয়া, ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন।

তথাহি প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি প্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতচ্ছ্রুতিস্মৃতিবাদেষু অসকৃদনুশ্রূয়মাণং ন শক্যং নাস্তীতিবদিতুম্।

—শারীরক সূত্র ১।৩।৩০।

অর্থাৎ—মনুষ্য হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত সকল দেহিগণের প্রাণিত্ববিষয়ে কোন বিশেষ না থাকিলেও, যেমন মনুষ্য হইতে নিম্নস্তরের প্রাণিগণের মধ্যে পর পরবর্ত্তী প্রাণীর জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রতিবন্ধ অর্থাৎ তিরোধান উত্তরোত্তর অধিকই হইয়া থাকে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকল দেহীর মধ্যে উত্তরোত্তর জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির অভিব্যক্তি উত্তরোত্তর অধিকই হইয়া থাকে—ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রভৃতি শাস্ত্রে বারম্বার কথিত হইয়াছে; সুতরাং এই প্রকার জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি বিষয়ে তারতম্য নাই—ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ আচার্য্য শঙ্করের উক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে—মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ বা প্রথমসমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী শরীরী পর্য্যন্ত দেহিগণের মধ্যেও জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের তারতম্য বিদ্যমান আছে। ইহাই যদি আচার্য্যের সিদ্ধান্ত হইল, তবে ইহা স্থির যে, হিরণ্যগর্ভ হইতে ভিন্ন প্রাণী মাত্রের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য হইতে অল্প। মহর্ষিগণও এই কারণে হিরণ্যগর্ভ হইতে ন্যূন জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন—ইহা যে আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের মতেও কোন মহর্ষিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা তাঁহারই উক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়ানিত্যমবিয়োগাৎ
প্রাজ্ঞস্ত সএব পরমেশ্বরঃ—শারীরক ভাষ্য ১।৩।৩।

সর্ব্বজ্ঞত্বরূপ প্রজ্ঞার বিয়োগ কখনও হয় না বলিয়া প্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বরই প্রাজ্ঞ।

নচাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ শ্রুতিমন্তরেণ কশ্চিদুপলভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং নিমিত্তাভাবাৎ শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানাং অপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানাপেক্ষাহি সিদ্ধিঃ সচ ধর্ম্মশ্চোদনালক্ষণঃ ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াশ্চোদনায়া ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষ বচনবলেন অতিশয়িতুং শক্যতে—শারীরকভাষ্য ২।১।১।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় বস্তুনিচয়কে—শ্রুতিরূপ প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহই জানিতে পারে, এই সম্ভাবনা করা যায় না। কারণ—কাহারও ঐরূপ অতীন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল এইরূপ কল্পনাও সাধু নহে কারণ তাঁহাদেরও ঐ প্রকার সিদ্ধি কারণসাপেক্ষ। ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বশতঃই ঐরূপ সিদ্ধি হয়। সেই ধর্ম্মও বেদমাত্র-প্রতিপাদ্য। সুতরাং পূর্ব্বসিদ্ধ বেদরূপ প্রমাণের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাকে পরে সিদ্ধ পুরুষগণের বচনের বলে অতিক্রম করিতে পারা যায় না।

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত এই সকল বচন হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু-বিষয়ে শ্রুতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পৌরুষেয় প্রমাণের প্রামাণ্য মীমাংসক আচার্য্যগণের ন্যায় আচার্য্য শঙ্করও অঙ্গীকার করিতেন না। মনুপ্রভৃতি আচার্য্যগণের বচনাবলী ও শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে—এই কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে লোকে তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে এই মাত্র, মীমাংসক আচার্য্য-গণের সহিত আচার্য্য শঙ্করের মতের পার্থক্য এই যে, মীমাংসকাচার্য্যগণ শ্রুতিকে পরমেশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে

শ্রুতি নিত্য বা স্বয়ংসিদ্ধ, আচার্য্য শঙ্করের মতে শ্রুতি ঈশ্বরপ্রকাশিত। মীমাংসকমতে এ সংসারে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নাই, আচার্য্য শঙ্করের মতে একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ; তিনি ছাড়া কেহই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ বেদরূপ প্রমাণের সাহায্যে অবগত হইয়া লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বচন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ হইতে পারে না—অর্থাৎ তাঁহারাও পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ ছিলেন, কেহই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হয়েন নাই। ইহাই শাস্ত্রসমস্যায় আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, আমার এই সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্পিত নহে, কিন্তু ইহাই শ্রৌত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য যে প্রযত্ন, তাহা নাস্তিকেরই প্রযত্ন—ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে এখনও বলিতেছি, পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি। এইরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়াও যদি আচার্য্য শঙ্কর মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্যেই বা কেন বীতশ্রদ্ধ হইবে?

দার্শনিকপ্রবর পতঞ্জলি এবং তদীয় যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বেদব্যাস এবং সেই ভাষ্যের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র এবং ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিককার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি আস্তিকশিরোমণি অপর দার্শনিকগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভবপর নহে, ইহা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। তাঁহারা যুক্তিসমূহের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যাহারা সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহারাই নিজের মনগড়া সর্ব্বজ্ঞের বচনের দোহাই দিয়া নিজের অনুমত আচার প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করে; পুরাণে, স্মৃতিতে বা ইতিহাসে ঋষিগণের প্রশংসার জন্য তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন—

তাঁহারা অভ্রান্ত ছিলেন, ও তাঁহারা ভগবান্ ছিলেন, এরূপ উক্তি বহুতর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু, ঐ সকল স্তুতিপর অর্থবাদের দ্বারা কোন ঋষিরই সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে না। ঐ সকল অর্থবাদ দ্বারা তাঁহাদের অসাধারণ জ্ঞান ও মহানুভাবতামাত্রই সূচিত হয়। আচার্য্যশঙ্করপ্রভৃতিদার্শনিকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, এ সংসারে সর্ব্বজ্ঞ দুই জন হয় না, যে সর্ব্বজ্ঞ, সে ঈশ্বরই হইয়া থাকে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তার অব্যভিচারী হেতু। যে সব বুঝে, সে সব অনুভব করে, সে সবই করিতে পারে। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। একের অধিক সর্ব্বজ্ঞ অঙ্গীকার করিলে প্রত্যেক সর্ব্বজ্ঞকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। এ সংসারে পরমেশ্বর এক জনই আছেন, দুই জন বা ততোধিক পরমেশ্বর হইতে পারে না। অনেক স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ একই সংসারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যবস্থাপূর্ব্বক কিছুতেই করিতে পারেন না, এইরূপ বহু অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা পরমেশ্বরেরই সর্ব্বজ্ঞতাকে ভারতের দার্শনিক আস্তিক আচার্য্যগণ ব্যবস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ সকল কথা যাঁহারা জানেন না, এই সকল যুক্তির সারবত্তা যাঁহাদিগের মস্তিকে প্রবেশ করে নাই, তাঁহারাই অপরের সর্ব্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিজের সংস্কারানুযায়ী আচার-পদ্ধতিকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন। এই বন্ধনই ভারতের হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশের কারণ। বিবেক যদি কলুষিত হয়, অন্ধবিশ্বাস যদি প্রবল হইয়া জগতের পারিপার্শ্বিক সত্য ঘটনানিচয়কে অন্যথাভাবে প্রদর্শন করে, তাহা হইলে মানুষের অধোগতি ও সর্ব্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

প্রাচীন ভারতের সনাতনধর্ম্মের ব্যবস্থাপক ঋষিগণের মধ্যে কিন্তু এরূপ অন্ধ বিশ্বাস কোন দিন ছিল না। মীমাংসাদর্শনের রচয়িতা মহর্ষি

জৈমিনি কিরূপ স্মৃতিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং কিরূপ স্মৃতিকে অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে, ইহারই নিরূপণ করিতে যাইয়া একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন—হেতুদর্শনাচ্চ।

—জৈমিনীয় দর্শন ১অঃ ৩য় পাঃ ১৪ সূত্র।

এই সূত্রের ব্যাখা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিয়াছেন—

লোভাদ্ বাস আদিৎসমানা ঔডুম্বরীং কৃৎস্নাং বেষ্টিতবন্তঃ কেচিৎ, তৎ স্মৃতের্বীজম্। বুভুক্ষমাণাঃ কেচিৎ ক্রীতরাজ্ঞকস্য ভোজন-মাচরিতবন্তঃ। অপুংস্ত্বং প্রচ্ছাদয়ন্তশ্চ অষ্টাচত্বারিশদ্ বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং চরিতবন্তঃ তত এষা স্মৃতিরিত্যবগম্যতে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যজমানের বস্ত্রকে লাভ করিবার লোভ-বশে ঔডুম্বরী শাখার সর্ব্বাংশে বস্ত্র দ্বারা আবরণ করিতে হইবে. এইরূপ স্মৃতি কল্পিত হইয়াছে, সোমক্রয়ের পর দীক্ষিতের গৃহে ভোজন করা কর্ত্তব্য, এইরূপ স্মৃতির মূল হইতেছে ঋত্বিক্‌গণের বুভুক্ষা। উপনয়নের পর আটচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেদব্রত করিতে হয়, এইরূপ যে স্মৃতি, তাহা কে রচনা করিয়াছে? তাহা রচনা করিরাছে—যাহার পুংস্ত্ব বা জননশক্তি ছিল না, এবং তাহা লোককে জানাইতে যে চাহিত না, সেইরূপ ব্যক্তিই এইরূপ স্মৃতির নির্ম্মাতা।

শবরস্বামীর এইরূপ উক্তির দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাগ ও দ্বেষ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীনকালে এখনকার ন্যায় অনেক ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিতেন। যুক্তির সাহায্যে তাহা প্রকৃত বেদার্থ কি না—ইহা বুঝিয়া লইবার ভার চিরদিন হিন্দুসমাজের বিবেকী ব্যক্তিমাত্রের উপরই নির্ভর করিত। এইরূপ হইত বলিয়াই পূর্ব্বকালে ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নামে প্রথিত ঋষিগণের প্রাণের ধর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া জাতির বিবেকশক্তিকে কলুষিত করিয়া অধঃপাতের পথকে প্রশস্ত করিতে পারিত না। হিন্দুশাস্ত্র ভারত মহাসাগরের ন্যায় অগাধগম্ভীর ও অপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুজাতি যেমন যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনই তাহারা দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল বুঝিয়া নূতন নূতন আচার গ্রহণ করিয়াছে। সেই সকল গৃহীত আচার বিহিত বলিয়া এবং পরিত্যক্ত আচার নিষিদ্ধ বলিয়া যে সকল শিষ্ট-প্রণীত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। এই ধর্ম্মগ্রন্থ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং আবশ্যক হইলে এখনও হইবে—এ কথা যিনি স্বীকার করেন না, তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের—হিন্দুসমাজের কিছুই বুঝেন না। ধর্ম্ম ঐহিক অভ্যুদয় ও পারলৌকিক শ্রেয়োলাভের উপায়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহলোকে হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কখনই হিন্দুর পারলৌকিক শ্রেয়োলাভের পথ হইতে পারে না—এই সার সত্য যিনি না বুঝেন, তাঁহার শত চেষ্টাতেও হিন্দু-সমাজের তিলমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে এ স্থানে আর অধিক বলিব না, প্রয়োজন হইলে সনাতন হিন্দুজাতির সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, হিন্দু-সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। হিন্দুর আচার—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—প্রত্যেক যুগেই পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, এখনও পরিবর্ত্তন লাভ করিতেছে। কালবশে কত পরিবর্ত্তন যে ইহাতে আসিবে, তাহার নির্ণয় করিবার সামর্থ্য বর্ত্তমানকালে কাহারও নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

(১)

অগ্রহায়ণের মাসিক বসুমতীর 'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' নামক প্রবন্ধে, ভাদ্রের বসুমতীতে প্রকাশিত 'শাস্ত্র-সমস্যা' প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদকর্ত্তা যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলই তাঁহার কাল্পনিক অথচ শাস্ত্রপ্রতিকূল যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। ঐ সকল কথার অসারতা এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রবন্ধ-লেখক শাস্ত্রের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই যে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত শাস্ত্রের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা বিভাগ-লক্ষণাক্রান্তই হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন,—"আম্নায়—বেদমন্ত্র সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌ভাগে তাহার বিস্তার।" এই লেখা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রতিবাদকর্ত্তা বেদমন্ত্রকেই আম্নায় শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই আম্নায়ই হইল সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌ভাগে সেই আম্নায়ের বিস্তার হইয়াছে। এই প্রকার উক্তি কিন্তু পূর্ব্ব-মীমাংসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

কারণ—আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্য মুচ্যতে—

জৈমিনিসূত্র ১ম অধ্যায়, ২য় পাদ, ২য় সূত্র।

এই সূত্রে অর্থবাদ আম্নায়ের প্রামাণ্য হইতে পারে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে। ইহাতে আম্নায় শব্দের অর্থ সমগ্র বেদ, ইহাই শবরভাষ্য ও কুমারিল ভট্ট-কৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কেবল

মন্ত্রভাগই যে আম্নায় শব্দের অর্থ, তাহা প্রতিবাদকর্ত্তারই প্রবন্ধে এই প্রথম দৃষ্ট হইল। বিধায়ক বাক্যকেও 'আম্নায়' এই শব্দের অর্থ বলিয়া মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী বহু স্থানে দেখাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি স্থানের উল্লেখই প্রদর্শনার্থ করা যাইতেছে।

এবং হি সমামনন্তি বেদমধীত্য স্নায়াৎ। ইহ চ বেদমধীত্য স্নাস্যন্ ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমান ইমমাম্নায়মতিক্রামেৎ। ন চাম্নায়ো নাম অতিক্রমিতব্যঃ।—মীমাসাংভাষ্য—১-১-১ সূত্র।

এই স্থানে ভাষ্যকার শবরস্বামী দুইবার 'আম্নায়' এই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইবার প্রযুক্ত 'আম্নায়' শব্দের দ্বারা তিনি 'বেদমধীত্য স্নায়াৎ' (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের পর স্নান করিবে, এইরূপ বিধিবাক্যটিকেই বুঝাইয়াছেন। প্রতিবাদকর্ত্তার লেখা অনুসারে কিন্তু আম্নায় শব্দের অর্থ বেদের মন্ত্রভাগ। আর যদি তাঁহারই প্রদত্ত দাঁড়িটিকে মুছিয়া ফেলিয়া, আমরা আম্নায় শব্দটিকে টানিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ এই তিনটির সহিত অন্বয় করি, তাহা হইলেও তাঁহার নিস্তার নাই। কারণ, এইরূপ করিলেও তাঁহার অভীপ্সিত বিভাগ পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট নিতান্ত অশুদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হইবে। কেন, তাহা বলি। আরণ্যক ও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ এইরূপবিভাগ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া উপনিষদ্ যেমন ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট, সেইরূপ তাহা মন্ত্রভাগের মধ্যেও প্রবিষ্ট, যেমন ঈশোপনিষদ্ যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট উপনিষদ্। সুতরাং আম্নায়ের বিভাগ – মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ এইরূপ চারি ভাগে করিতে যাইয়া, প্রতিবাদকর্ত্তা নিজেরই ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পরেই তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ; সুতরাং পণ্ডিত মাত্রেরই

অশ্রদ্ধেয়। তিনি লিখিয়াছেন,—"বেদের অংশবিশেষ বিলুপ্ত হইলে, তাহার অর্থ স্মরণ করিয়া বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই উপদেশ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ।"

এইরূপ উক্তির দ্বারাও প্রতিবাদকর্ত্তা নিজের মীমাংসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমরা ইহার প্রতিকূল কথাই দেখিতে পাই। মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম—'বার্ত্তিক।' এই 'বার্ত্তিকের' তন্ত্রবার্ত্তিক নামে যে অংশ আছে, তাহাতে বার্ত্তিকরচয়িতা কুমারিল ভট্ট ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচারপ্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

কথমনুপলব্ধিরিতি চেদুচ্যতে—

শাখানাং বিপ্রকীর্ণত্বাৎ পুরুষাণাং প্রমাদতঃ।
নানাপ্রকরণস্থত্বাৎ স্মৃতের্মূলং ন দৃশ্যতে॥

যত্তু কিমর্থং বেদবাক্যান্যেব নোপসংগৃহীতানীতি। সম্প্রদায়বিনাশভীতেঃ। বিশিষ্টানুপূর্ব্ব্যা ব্যবস্থিতো হি স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ শ্রূয়তে। স্মার্ত্তাশ্চাচারাঃ কেচিৎ ক্বচিৎ কস্যাঞ্চিৎ শাখায়াম্। তত্রাপি তু কেচিৎ পুরুষমেবাধিকৃত্যাম্নায়ন্তে। যেন ক্রতুপ্রকরণাম্নাতাঃ কেনচিন্নিমিত্তেনোৎকৃষ্যমাণাঃ পুরুষধর্ম্মতাং ভজন্তে। যথা মলবদ্‌বাসসা সহ ন সংবদেত্তস্মান্ন ব্রাহ্মণায়াবগুরেদিত্যেবমাদয়ঃ। তত্র যদি তাবত্তান্যেব বাক্যান্যুদ্ধৃত্যাধ্যাপয়েয়ুস্ততঃ ক্রমান্যত্বাৎ স্বাধ্যায়বিধি-বিরোধঃ স্যাৎ।"

ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলভূত শ্রুতিসমূহ কেন উপলব্ধ হয় না—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর হইতেছে যে, বেদের শাখাসমূহের বিপ্রকীর্ণতা, পুরুষগণের প্রমাদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপজীব্য মূল শ্রুতিগুলির নানা প্রকরণে অবস্থিতি-নিবন্ধন স্মৃতির মূল বেদবাক্য উপলব্ধ হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিগণ:

মূলভূত বেদবাক্যগুলিকেই একত্র সংগ্রহ করিয়া উপনিবদ্ধ করেন নাই কেন?—এইরূপ যে প্রশ্ন, তাহারও উত্তর এই হইতেছে যে, এইরূপ না করিবার কারণ—সম্প্রদায়ের বিনাশভীতি। বিহিত আনুপূর্ব্বীর দ্বারা ব্যবস্থিত বেদকে অধ্যয়ন করিতে হইবে—ইহা শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে যে সমুদয় আচার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটি কোন শাখায় ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও কতকগুলি আচার পুরুষবিশেষকে অধিকারিরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে—এই কারণে তাহা কোনও যজ্ঞবিশেষের প্রকরণে পঠিত হইলেও, কোনও নিমিত্তবিশেষবশতঃ উৎক্রম্যমাণ হইয়া অর্থাৎ স্থানান্তরে নীত হইয়া, পুরুষধর্ম্মতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ 'মলিনবস্ত্রধারীর সহিত আলাপ করিবে না,' 'সেই কারণে ব্রাহ্মণকে দণ্ডের দ্বারা আহত করিতে উদ্যত হইবে না' এই সকল আচারগুলি উদ্ধৃত হইতে পারে।

এখন যদি, আচার্য্য বেদের কোন অংশবিশেষ অধ্যাপনা করাইবার সময়, ঐ সকল আচারের মূলভূত শ্রুতিবাক্যকে ভিন্ন প্রকরণ বা বিভিন্ন শাখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে শ্রুতিপাঠের ক্রম বা অব্যবহিত পূর্ব্বাপরভাবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, বেদবাক্যের অধ্যাপনা করা নিবন্ধন—নিয়ত আনুপূর্ব্বীর সহিত বেদ পড়িতে হইবে, এইরূপ যে বিধিবাক্য আছে, তাহার বিরোধ হইতে পারে। ইহার পরই বার্ত্তিককার আরও বলিতেছেন—

অনেন চ নির্দ্দেশেন অন্যেঽপি অর্থবাদোদ্ধারেণ বিধিমাত্রমধীয়ীরন্ কর্ম্মৌপয়িকমাত্রং বা। তত্র বেদপ্রলয়ঃ প্রসজ্যেত। ন চ অবশ্যং মন্বাদয়ঃ সর্ব্বশাখাধ্যায়িনস্তে হি প্রযত্নেন শাখান্তরাধ্যায়িভ্যঃ শ্রুত্বা অর্থমাত্রং স্ববাক্যৈরবিস্মরণার্থং নিবধ্নীয়ুঃ। ন চ বাক্যবিশেষো জ্ঞায়তে।

অর্থাৎ এইরূপ নির্দ্দেশের দ্বারা অর্থাৎ অধ্যয়নের যেরূপ বিধি আছে, তাহার অতিক্রমের দ্বারা—অন্য ব্যক্তিও অর্থবাদকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিমাত্রই অধ্যয়ন করিতে পারে, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অপেক্ষিত অংশমাত্রও পাঠ করিতে পারে, তাহাই যদি করে, তবে বেদের প্রলয় হইবার প্রসক্তি হয়! আরও এক কথা এই যে, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যে বেদের সকল শাখাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা যত্ন করিয়া শাখান্তরাধ্যায়ী ব্যক্তিগণের মুখে বেদের অপেক্ষিত অর্থমাত্রই শুনিয়া লইতেন এবং যাহাতে ভুলিয়া না যান, তাহার জন্য স্বরচিত বাক্যে তাহা নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেইজন্য সেই মূলভূত বাক্যবিশেষ জ্ঞাত হয় না।

স্মৃতির মূলভূত বাক্যগুলি কেন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্বপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া কুমারিল ভট্ট এ বিষয়ে এই চরম সিদ্ধান্তই তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। প্রতিবাদকারী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার মতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, তিনি বলিয়াছেন -'যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা।' কুমারিল বলিতেছেন মনু বেদের অধ্যেতা; সকল বেদই যে তিনি বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহাও নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি হইলেই তাঁহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, ইহা কোন হিন্দুশাস্ত্রে নাই, সুতরাং ইহাও প্রতিবাদ কর্ত্তার আজগুবি কল্পনা। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে সায়ম্ভুব মনুর নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিবাদকর্ত্তা নিজেই দেখাইয়াছেন—পরাশর, যম, শঙ্খ, গৌতম,

বশিষ্ঠ, অত্রি ও উশনাঃ এই কয় জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ; সুতরাং তাঁহার মতে ইঁহাদিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্রপদবাচ্য। কিন্তু ভারতের আপামরবিদিত মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র—এই নবীন-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থাপয়িতা নবীন-মহামহোপাধ্যায় প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয়ের মতানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। শুধু কি তাহাই ?

স্মৃতিচন্দ্রিকায় দেখিতে পাই,—

তেষাং মন্বঙ্গিরো-ব্যাস-গৌতমাত্র্যশনোযমাঃ।
বশিষ্ঠ-দক্ষসম্বর্ত্ত-শাতাতপপরাশরাঃ॥
বিষ্ণ্বাপস্তম্ব-হারীতাঃ শঙ্খঃ কাত্যায়নো গুরুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগী বৌধায়ন-পিতামহৌ॥
সুমন্তঃ কশ্যপো বভ্রুঃ পৈঠীনো ব্যাঘ্র এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা॥
জাবালির্জমদগ্নিশ্চ লোগাক্ষির্ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ইতি ধর্ম্মপ্রণেতারঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ॥

সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষির মধ্যে ষট্‌ত্রিংশৎ এই পারিভাষিক সংখ্যাশব্দ দ্বারা নিম্নলিখিত ঋষিগণকে বুঝা যায়—মনু, অঙ্গিরা, ব্যাস, গৌতম, অত্রি, উশনঃ, যম, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সম্বর্ত্ত, শাতাতপ, বিষ্ণু, আপস্তম্ব, হারীত, শঙ্খ, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, প্রচেতাঃ, নারদ, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, বৌধায়ন, পিতামহ, সুমন্ত, কশ্যপ, বভ্রু, পৈঠীন, ব্যাঘ্র, সত্যব্রত, ভরদ্বাজ, গার্গ্য, কার্ষ্ণাজিনি, জাবালি, জমদগ্নি, লোগাক্ষি ও ব্রহ্মসম্ভব।

ইহা ছাড়াও স্মৃতিচন্দ্রিকাতে—বৎস, মরীচি, দেবল, পারস্কর, পুলস্ত্য,

পুলহ, ক্রতু, ঋষ্যশৃঙ্গ, লিখিত ও ছাগলেয় প্রভৃতি বহু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ-ঋষিগণের নামও নিম্নে লিখিত হইতেছে,—

মধুচ্ছন্দা, বিশ্বামিত্র, মেধাতিথি, প্রস্কন্ন, কাণ্ব, পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, শুনঃশেফ, গৌতম, কশ্যপ, দীর্ঘতমা, অগস্ত্য, জমদগ্নি, সংবনন, ভার্গব, উশনাঃ, বামদেব, অত্রি, অঙ্গিরা, চ্যবন, মুদ্গল, চিরণ, ভৃগু, পর্ব্বত, নারদ, সপ্তর্ষি, সম্বর্ত্ত বৈখানস, উপমন্যু, গৃৎস্যমদ, পুরুভূ, সংকুসিক, সিন্ধুক্ষিত, দমন, শঙ্খ, মান্দর্য্য, বিমন্দবংশীয়গণ, সোমাহুতি, নেম, সিন্ধুদ্বীপ, কৃষ্ণ, বৎসপ্রি, যামায়ন, সপ্তগু, বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, বিহব্য, বামদেব্য, অর্বুদ, অর্ব্বণ, শবর, পতংশ, সত্যবৃত্তি, প্রথ, ইষ্ট, বিভ্রাট ও আভিবর্ষ প্রভৃতি।

পাঠকগণ দেখিয়া লউন, উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ ঋষিগণের মধ্যে কয় জন ঋষি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ঋষিকেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবাদকারী মহাশয়ের মতানুসারে চলিতে হইলে মনু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের প্রণীত সকল শিষ্টসম্মত ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের মতানুসারে চলিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। ব্যবস্থা মন্দ নহে, নূতন করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থাপনে উদ্যত প্রতিবাদকারী মহাশয় নিজের জালে এমনই জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, তিনিই সর্ব্বাগ্রে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-মাত্রের জীবনস্বরূপ অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের উচ্ছেদ করিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া—হিন্দুসমাজের সংস্কারক নব্য সম্প্রদায়ের সংস্কার-কার্য্যের পথ দেখাইবার জন্য চাতুর্য্যের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন!

(২)

'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধের প্রথমেই প্রতিবাদকর্ত্তার উক্তি এইরূপ—'বেদব্যাস-সংকলিত পুরাণসংহিতার মূল পুরাণ অতীব প্রাচীন। কারণ, বাল্মীকীয় রামায়ণের আদিকাণ্ডে আছে—'শ্রূয়তাং যৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ যথাশ্রুতম্' ইত্যাদি।

প্রতিবাদকর্ত্তার মতে মূলপুরাণ কি, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। বেদব্যাস-সঙ্কলিত পুরাণসমূহ-ব্যতিরিক্ত মূলপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলপুরাণ যে ছিল, তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদকর্ত্তার সহায় হইয়াছে রামায়ণের কেবল একটি বচন। ঐ রামায়ণের বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনত্ব আছে কি না, এ বিষয়ে কিন্তু পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে রামায়ণকথার উল্লেখ আছে, ইহা সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত যে গ্রন্থ, তাহাই যে মহাভারতের পূর্ব্বে ছিল, এ বিষয়ে কোনও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই কারণে বহু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বর্ত্তমান-কালের প্রচলিত রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্বে ছিল, তাহা স্বীকার করেন নাই; প্রত্যুত রামায়ণ যেরূপ ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে যে, বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত রামায়ণ মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। মহাভারত-রচনার পূর্ব্বে রামচন্দ্রের ইতিবৃত্ত ভারতে অজ্ঞাত ছিল না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু, তাই বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে বাল্মীকি-বিরচিত-রামায়ণ বলিয়া যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই গ্রন্থই যে মহাভারত রচনার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে প্রতিবাদকর্ত্তার

আবিষ্কৃত নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ যে পর্য্যন্ত সাধারণসমক্ষে প্রচারিত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর কেহই আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। বেদব্যাস-রচিত পুরাণসমষ্টির মূলভূত পুরাণ-নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যে পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা যে রামায়ণমাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে অল্পজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারদ সনৎকুমারের নিকট নিজের অধীত গ্রন্থসমূহের পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।"

"ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছি এবং পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি।"

নারদের এই উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বেদের ন্যায় আদিতে ইতিহাস-পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বৈদিকযুগেও বিদ্যমান ছিল। তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, মহাভারতে রামায়ণের কথা আছে—এই কারণে, বর্ত্তমান সময়ে বাল্মীকির রচিত বলিয়া প্রচলিত রামায়ণও মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ যে যুক্তি, তদনুসারে চলিতে গেলে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নাস্তিকমতাবলম্বনে উপদেশ দিতে উদ্যত জাবালিকে ভগবান্ রামচন্দ্র যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবকে তিনি চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরই এই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। ইহা রামায়ণের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। তাহাই যদি হইল, তবে এই রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে কি করিয়া রচিত হইতে পারে? তাহার পর রামায়ণের পূর্ব্বে মূল

পুরাণ ছিল, প্রতিবাদকর্ত্তার এই কথা মানিতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু সেই মূল পুরাণরূপ শাস্ত্র যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহাও স্থির। সেই পুরাণশাস্ত্র অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজ কি করিয়া পরিচালিত হইবে, তাহার উত্তর প্রতিবাদকর্ত্তার লেখনীমুখে দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

আমি শাস্ত্রসমস্যায় লিখিয়াছিলাম—মহাভারত-রচনার সময় যে শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহার দ্বারাই হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইবে বা তাহার পরবর্ত্তী কালে রচিত শাস্ত্রের দ্বারাও হিন্দু-সমাজ চলিবে, তাহারই নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রতিবাদকর্ত্তা, মহাভারত রচনার পূর্ব্বে মূল পুরাণ ছিল, এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন, সে মূল পুরাণ কি, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, সে সমস্ত পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। অথচ প্রতিবাদকর্ত্তা বলিতে চাহেন যে, ঐ সকল মূল পুরাণ অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হইবে। ব্যবস্থা মন্দ নহে। এ বিচিত্র যুক্তির সারবত্তা পাঠকগণের উপভোগ্য, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥—মনু ২অঃ ৪৮ শ্লোঃ।

এইরূপ বচন আছে বটে, কিন্তু অন্য বচনও আছে—

সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নায়ন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥

—মনু, ২ অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক।

এই দুইটি বচনের অর্থ মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই বেদ যদি কেবলমাত্র গায়ত্রীও হয়, সদাচারী থাকিয়া তাহা লইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু অসদাচারপরায়ণ হইয়া ত্রিবেদজ্ঞ হওয়াও ভাল নহে। মনু বলিয়াছেন—প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রীজপ যদি প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় করা যায়, তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়। মনু এতৎপক্ষে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রণবব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী বেদত্রয়ের সারভূত।—মনু ২।৭৬—৭৮"।

মনুর উক্ত দুইটি বচনের অর্থ মিলাইয়া দেখিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা নহে। মেধাতিথি প্রভৃতি মনুসংহিতার ব্যাখ্যাতৃগণ উহা অন্য প্রকারেই বুঝিয়াছিলেন।—"সাবিত্রী-মাত্রসারোঽপি" এই বচনটির অর্থ করিতে যাইয়া মেধাতিথি বলিয়াছেন—"অভিবাদনাদ্যাচারবিধেস্তুতিরিয়ম্" অর্থাৎ এই বচনে যাহা বলা হইতেছে, তাহার দ্বারা পূর্ব্বে কথিত যে গুরু প্রভৃতির অভি-বাদনবিধি, তাহারই প্রশংসা বা স্তুতি করা হইতেছে। অর্থাৎ ইহার দ্বারা এমন কিছু বলা হয় নাই, যাহাতে এরূপ বোধ হয় যে, বেদের অধ্যয়ন না করিয়া কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলেই ব্রাহ্মণরক্ষা হইবে। "প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রীজপ যদি প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় করা হয়, তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়" এইরূপ উক্তির দ্বারাও গায়ত্রী-পাঠের প্রশংসামাত্র করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বেদপাঠ না করিয়া কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলেই যে বেদাধ্যয়নের বিধি চরিতার্থ হইবে, তাহা কোন মীমাংসকই কল্পনা করিতে পারেন না। বেদপাঠের ফল দ্বিবিধ—ঐহিক ও পারত্রিক। ঐহিক ফল হইল বেদার্থজ্ঞান। বেদ না পড়িয়া কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলে এবং প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে হাজারবার জপ করিলেই বেদপাঠের ঐহিক ফল যে বেদার্থ-

জ্ঞান, তাহা হইতে পারে, এ কথা প্রতিবাদকর্ত্তা বলিলেও প্রমাণবাধিত বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। বেদার্থজ্ঞান করিতে হইলে বেদের রীতিমত অধ্যয়ন করিতে হইবে, ইহাই হইল সকল শিষ্ট পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় যদি বলেন যে, মনু যখন বলিতেছেন যে, কেবল গায়ত্রীটুকু পড়িলে ও তাহার হাজারবার প্রত্যহ জপ করিলে তাহাতেই সহস্র বেদপাঠের ফল হয়, সেই ফল ঐহিক অর্থজ্ঞানও বটে এবং পারলৌকিক স্বর্গাদিও বটে, তাহা হইলে মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে সমগ্র বেদপাঠের কোন আবশ্যকতাই থাকে না। শাস্ত্রে আছে—

অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।

ঘরের কোণে বা আকন্দগাছে যদি মধু পাওয়া যায়, তবে পাহাড়ে যাইবার আবশ্যকতা কি? গায়ত্রী জপ করিলেই যদি বেদোদিত নিখিল ধর্ম্মকর্ম্মের জ্ঞান হয়, তবে আবার নানাবিধ ব্রতের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদার্থজ্ঞানের জন্য পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা কি?

বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাবিধি যতই লুপ্ত হইতে লাগিল, ততই সমগ্রবেদাধ্যয়নবিরহিত গায়ত্রীমাত্রসার ব্রাহ্মণকুলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য মনুবচনের ও এইজাতীয় অন্যান্য শাস্ত্রীয় বচনের এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা উদিত হইতে লাগিল এবং তাহাই ভারতবর্ষে প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ্যের বিলোপের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ সঙ্কোচের কারণ—অশক্ততা। এই অশক্ততার ফলেই জীবন্ত জাতির প্রয়োজনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য. অর্থশাস্ত্র পর্য্যন্ত সকল বিজ্ঞান ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইয়া রঘুনন্দনের স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানি পুঁথি ও তান্ত্রিক দীক্ষাপদ্ধতি-মাত্রে এদেশে ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোমুখী মনীষার শোচনীয় পর্য্যবসান

ঘটিয়াছিল। মনুবচনের কোন্‌টা স্তুতিপর আর কোন্‌টাই বা বিধিপর, তাহার বিচার করিবার বুদ্ধি লুপ্ত হওয়ায় দেশে এই সকল অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে—ইহাই বুঝাইবার জন্য আমি "শাস্ত্রসমস্যা" প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ্যের পদমর্য্যাদা যাঁহার বড় প্রিয়, তিনি অগ্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউন, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ এখনও তাঁহার চরণে আনত হইবে। কেবল গায়ত্রী পড়ি, আর গায়ত্রী জপ করি, সুযন্ত্রিত কাহাকে বলে—তাহা বুঝি না, সুযন্ত্রিত হইবার জন্য কোন চেষ্টাই নাই, নিতান্ত প্রাকৃত লোকের মত সকল কার্য্যই করিয়া থাকি অথচ ঐরূপ কার্য্যের অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে বলিয়া লোককে বুঝাই—এইরূপ বিকৃতবুদ্ধি ও মিথ্যাচারী ব্যক্তিগণের পরিচালনায় ধর্ম্মলোপই হইয়া থাকে, অধর্ম্মও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—'শাস্ত্রসমস্যা' প্রবন্ধে ইহাই আমি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে অন্যত্র লেখা হইয়াছে—

"শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাও প্রকাশ না করিয়া প্রত্যুত শাস্ত্রে ঐ সকল কথা নাই, এরূপ মিথ্যা প্রচারে যাহারা লোকের হৃদয়ে শাস্ত্রানুগত সদাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইতে অণুমাত্র শঙ্কিত নহে, তাহারা শাস্ত্রীয় বচনের অপব্যাখ্যায় যে সঙ্কোচ বোধ করে না, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে দুইটি বচন এ স্থলে উদ্ধৃত করিব—

১। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

২। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

ইহার অপব্যাখ্যা—'এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী এবং সেই প্রকৃত পণ্ডিত। সে দানের যোগ্যপাত্র, তাহা হইতে প্রতিগ্রহও বিধেয়।' এবং 'যেমন রসশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কাংস্য সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা সকল মনুষ্যই দ্বিজত্ব লাভ করিয়া থাকে।' এই শ্লোকে 'দ্বিজত্ব' এই শব্দটির অর্থ 'বিপ্রত্ব' বা 'ব্রাহ্মণত্ব।' ইত্যাদি"।

এই শ্লোকে 'দ্বিজত্ব' এই শব্দটির অর্থ যে 'বিপ্রত্ব' করা হইয়াছে, তাহা আমার কল্পনাপ্রসূত নহে, কিন্তু হরিভক্তিবিলাস-নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থের টীকাকার শ্রীমৎসনাতনগোস্বামী হরিভক্তিবিলাসধৃত উক্ত বচনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নিজেই বলিয়াছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা"।

বৈষ্ণবশাস্ত্রের কোন খোঁজ না রাখিয়া ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের স্বরূপ না বুঝিয়া প্রতিবাদকর্ত্তা কেবল আত্মকল্পনার উপর নিভরপূর্ব্বক উক্ত ব্যাখ্যাকে 'অপব্যাখ্যা' বলিতে সাহসী হইয়াছেন। জিদ্ এমনই জিনিষ বটে, এই জিদের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে উদ্যত হয় এবং অপরের প্রামাণিক ব্যাখ্যাকে 'অপব্যাখ্যা' বলিতে বৃথা সাহস করে, তাহা হইলে তাহার ধার্ম্মিকতার উপর লোকের বিশ্বাস কিরূপে থাকিতে পারে ?

ইহার মধ্যে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই যে বিধিবাক্য, তাহাকে—নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য—প্রতিবাদ-কর্ত্তা 'অর্থবাদ' বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন—"প্রথম শ্লোকে 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং, এই অংশে বিধিবাক্য থাকায় ইহা অর্থবাদ, প্রশংসামাত্র নহে—অপব্যাখ্যাকারীরা এরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধিবাক্য নহে, ইহা অন্যার্থ-

বোধক অর্থবাদ, সে সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহা সাধারণের সহজ-বোধ্য নহে, এই কারণে এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা করা হইতেছে। বিধিবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াই এই আলোচনা।"

'অপব্যাখ্যাকারীরা' এইরূপ বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া মানিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যাখ্যা 'অপব্যাখ্যা' নহে, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। কারণ, এরূপ ব্যাখ্যায় কোন দোষই প্রতিবাদকর্ত্তা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধিবাক্য নহে, ইহা অন্যার্থবোধক অর্থবাদ।" ইহা যে 'অন্যার্থ-বোধক অর্থবাদ', তাহা প্রমাণ করিবার ভার কিন্তু প্রতিবাদকর্ত্তা নিজে গ্রহণ করেন নাই, চালাকী করিয়া তাহা তা-না-না-না করিয়াই সারিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এ সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহা সাধারণের সহজসাধ্য নহে; এই কারণে এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।" স্পষ্টশ্রুত বিধিবাক্যকে বিনা প্রয়োজনে অর্থবাদ-রূপে কেন নির্দ্দেশ করিতে হইবে, ইহা সাধারণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা দেখাইতে চাহেন না; ইহা 'সাধারণের সহজবোধ্য নহে।' তাঁহার প্রবন্ধে যাহা 'সাধারণের সহজবোধ্য নহে' এরূপ কথাই শতকরা ৯৯টী আছে। তাহা সত্ত্বেও প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয়ের এই অত্যাবশ্যক বিচার সাধারণের সহজবোধ্য হইবে না বলিয়া, কৃপাবশে তিনি আর তাহা করিতে উদ্যত হইলেন না। দর্শন, বিজ্ঞান বা ধর্ম্মশাস্ত্রের এমন কোন্ জটিল তত্ত্ব আছে, যাহা পরিষ্কাররূপে অধিগত হইলে এবং উপযুক্ত প্রকাশক্ষমতা থাকিলে ব্যাখ্যাতা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বোধগম্য করিতে পারেন না? পাঠকের বুদ্ধিকে গালি পাড়িয়া, নিজ বক্তব্যের গলদ ঢাকিবার এইরূপ চেষ্টা চাতুরী ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে. সে চাতুরী অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষু এড়াইতে

পারে না। এইরূপ বিধিবাক্যকে 'অর্থবাদ' বাক্যরূপে নির্দ্দেশ কোন মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। প্রতিবাদকর্ত্তা মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করুন যে, "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই বচনে দান ও প্রতিগ্রহের বিধান করা হয় নাই, কিন্তু ইহা অর্থবাদমাত্র। যে পর্য্যন্ত এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহার অধিক বলা বৃথা। তাহার পর বিধিবাক্য-রূপেই গ্রহণ করিয়া তিনি বিধিবাক্যবাদিগণের মতে দোষ দিবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও যেরূপ সারবান্ সেইরূপই চমকপ্রদ! তিনি বলিয়াছেন,—"তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই যে 'দেয়ং' ও 'গ্রাহ্যং' আছে, ইহাতে কোন্ বস্তু দেয় বা কোন্ বস্তু গ্রাহ্য, তাহার ত কোন নির্দ্দেশ নাই। ভক্ত-অভক্ত-নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে সামান্যতঃ দানবিধি আছে—বিশেষ ফলের জন্যই বিশেষ বিধি। যথা—

সর্ব্বত্র গুণবদ্দানং শ্বপাকাদিষ্বপি স্মৃতম্।
দেশে কালে বিধানেন পাত্রে দত্তং বিশেষতঃ ॥—গীতা।

শ্বপাক প্রভৃতি অস্পৃশ্যজাতিকে দান করিলেও ফল আছে, তবে দেশকালপাত্রে বৈধদানে বিশেষ ফল হয়। অতএব এখানে 'তস্মৈ দেয়ং' বলিয়া কি ফল হইল? 'গ্রাহ্যং' 'প্রতিগ্রাহ্যং' নহে। শ্বপাকাদি হীন জাতিও ব্রাহ্মণাদি ভূঁস্বামীকে নজরাণা দেয়, ব্যবস্থাপত্র লইয়া ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতকেও যে 'তৈলবট' প্রদান করে, তাহা ত গ্রাহ্য আছেই। স্মৃতিগ্রন্থেও আছে "আনতিকরত্বেন ন দোষঃ।" ইহা দৃষ্টার্থ দান, অদৃষ্টার্থ নহে—দৃষ্টার্থ ত্যক্ত বস্তুর স্বীকার গ্রহণরূপ ও অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত বস্তুর স্বীকার প্রতিগ্রহরূপে শাস্ত্রে ব্যবহৃত। শ্বপাক বা

ম্লেচ্ছাদির দত্ত বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 'চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ, পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি।' (মনু)। 'তস্মৈ দেয়ং' ইত্যাদি বচন দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রকথিত বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তনই করা হইয়াছে, ইহাতে ভক্তের প্রশংসাও হয় না, সকলকেই যাহা দান করা যায় ও সকলের নিকট হইতেই যাহা গ্রহণ করা যায়, ভক্তের পক্ষে তৎসম্বন্ধে বিশেষবিধি নিরর্থক।"

চমৎকার যুক্তি বটে, স্মৃতিশাস্ত্রে সকলকেই দেওয়া যায় বলিয়া বিধি আছে। 'তস্মৈ দেয়ং' এই বিধির দ্বারা অতিরিক্ত ফল কি লাভ হইল, ইহাই প্রতিবাদকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহা যখন বিধিবাক্য বলিয়া, তিনি নিজেই বিচারের অনুরোধে মানিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন ইহার ফল যে কিছু আছে, তাহা ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে মানিতে হইবে। স্মৃতিশাস্ত্রে সকল ব্যক্তিকেই দান করিবার যে বিধি আছে, প্রতিবাদকর্ত্তা বলিতে চাহেন যে, এখানেও এই বিধির দ্বারা তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছু বুঝাইতেছে না। প্রতিবাদকর্ত্তার এই মতই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বাক্য অনুবাদমাত্রই হয়, ইহার বিধিরূপতা থাকিতে পারে না। কারণ, যাহা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা অনধিগত, তাহারই বোধক কার্য্যপর বাক্যকে বিধিবাক্য বলে। স্মৃতিশাস্ত্রে যেরূপ দান চণ্ডালকে করা যাইতে পারে বা দৃষ্টফলের জন্য চণ্ডালকে যে লৌকিক দান প্রসিদ্ধ আছে, এই বাক্যের দ্বারা যদি তাহাই প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে ইহার বিধিরূপতা থাকে কিরূপে? প্রতিবাদকর্ত্তা কিন্তু বিচারের খাতিরে 'অপব্যাখ্যাকারী'দিগের উপর দয়াপরবশ হইয়া 'তস্মৈ দেয়ং, ততো গ্রাহ্যং' এই দুইটিকেই বিধিবাক্য বলিয়া নিজেই মানিয়া লইয়াছেন, অথচ ইহার যেরূপ ব্যাখা করিতেছেন, তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, এই বাক্য দুইটি লোকপ্রসিদ্ধ বা

স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত যে দান ও গ্রহণ, তাহাই প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং ইহা বিধিবাক্য নহে। বিধিবাক্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া হইল, অথচ ইহা লোক ও স্মৃতিপ্রসিদ্ধ দান ও গ্রহণের অনুবাদকও হইল। মীমাংসা ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহার সামান্য ব্যুৎপত্তি আছে, তাহার মুখে এরূপ প্রলাপ কখনও সম্ভবপর নহে।

আরও একটি কথা এই যে, ম্লেচ্ছ যদি ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে 'বিপেন্দ্র' হইবে, 'জ্ঞানী' হইবে ও 'পণ্ডিত হইবে, এই কথা পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়া তাহার পর 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এই প্রকার বিধান করা হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এই বিধির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, ম্লেচ্ছ যদি ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ম্লেচ্ছত্ব নিবৃত্ত হয়, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিপ্রেন্দ্রকে যে দান করা যায় বা তাহার নিকট যে দান গ্রহণ করা যায়, ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন ম্লেচ্ছকেও সেই দান করিতে পারা যায় এবং করা উচিত, তাহার নিকট সেইরূপ দান গ্রহণও করিতে পারা যায় এবং করা উচিত। জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিপ্রেন্দ্রকে দান করিলে যে পুণ্য হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে যে পুণ্য হয়, যথার্থ ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন ম্লেচ্ছকেও দান করিলে সেই প্রকার পুণ্যই হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলেও সেইরূপ পুণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ যে ফল, তাহা স্মৃতি ও লোকে প্রাপ্ত না হইলেও এই বিধিবাক্যপ্রভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিধিবাক্যের এইরূপ ফলই কল্পনা করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ব্যবহারের দ্বারাও ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, বৈষ্ণব ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট আছে যে—শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে অন্য অভক্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে

উপেক্ষা করিয়া ভাগবতচূড়ামণি যবন শ্রীহরিদাসকে আদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধে পাত্রীয় অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে পাত্রীয় অন্ন-ভোজনের অধিকার নিষ্ঠাবান্ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরই আছে—ইহা স্মার্ত্তমাত্রেই জানেন, সুতরাং শ্রীপাদ আচার্য্যগোস্বামি-প্রভুর ব্যবহারের দ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভগবদ্‌ভক্ত চাণ্ডাল হইলেও সে—পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে যেরূপ অদৃষ্টার্থ দান করা যায়—সেইরূপ দানেরই পাত্র হইয়া থাকে। ইহা 'অপব্যাখ্যাকারীদিগের কল্পনাপ্রসূত' বস্তু নহে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ইহাই সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের মূলভূত প্রমাণ হইতেছে—

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।

ইহা যে বিধিবাক্য, অর্থবাদ নহে, তাহা স্থির এবং এই বিধিবাক্য-অনুসারেই বঙ্গের শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়প্রবিষ্ট শিষ্টগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইতিহাসও তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ভারতবর্ষ চিরদিনই সাধু ও ভক্তের সেবার জন্য প্রসিদ্ধ। এবং এই সেবা স্মার্ত্তবিধানের আক্ষরিক—অর্থপ্রতিপালনেই আবদ্ধ ছিল না ও থাকিতে পারে না। যে মহাপুরুষে ভগবদ্‌ভক্তি, ত্যাগ ও তপস্যার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, জাতির বিচার বা স্মার্ত্তব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া হিন্দু তাহারই নিকট প্রণত হইয়াছে। এবং যুগযুগানুসৃত এই আচার যে শিষ্ট নহে বা শাস্ত্রানুকূল নহে, তাহা বলা কেবল সঙ্কীর্ণবুদ্ধি সম্প্রদায়পরিপোষকের পক্ষেই সম্ভব। এবং সেইরূপ ব্যক্তিই "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং" এই প্রামাণিক বাক্যকে নজরাণা দান বা তৈলবট গ্রহণের নজীর মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

আবার এইরূপ সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই "শাস্ত্র ও

ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের একমাত্র অভিসন্ধি নহে—নিজের ও নিজ বংশধরগণের পাণ্ডিত্য, চরিত্র-মাহাত্ম্য ও আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞাপনও ইহাতে সুকৌশলে প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্যই দ্বিতীয় প্রবন্ধের ২২ কলমের অর্দ্ধেক অপ্রাসঙ্গিক আপনার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এবং সে কাহিনী প্রাকৃত কার্য্যকলাপের অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার চরম দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্মযুক্তির বলে দেখান হইয়াছে যে—প্রতিবাদকর্ত্তার পুত্রগণকে ইংরাজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্য—টোলের ছাত্রগণে সাধারণতোদৃষ্ট আত্মাবমাননা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা, অর্থাগমের সৌকর্য্যবিধান নহে। যদি বা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী একান্তই অর্থকরী স্থপতিবিদ্যায় নিরত হইয়া থাকে, তাহাতেও কোন হানি হয় নাই—কারণ তাহার অন্তর "মধুবিদ্যা"য় পরিপূর্ণ বলিয়া তাহার পিতাই তাহাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। এই অশ্রুতপূর্ব্ব 'মধুবিদ্যা'টি কি, বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি এখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে প্রতিবাদী মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্ব্বদোষঘ্ন, এহেন 'মধুবিদ্যা'র পরিচয় দিয়া এই মধুহীন দেশে আবার—"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জীর্ণমূলকে মধুবৃষ্টির দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

(৩)

"শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"দীক্ষা প্রকরণে আছে—'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন'—অন্যে নহে" ইত্যাদি। ইহারই প্রমাণরূপে তিনি সনাতন গোস্বামীর মত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা

নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচারের বিরুদ্ধ হইয়াছে। কেন তাহা বলি—

বৈষ্ণব-দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়—এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত আমি ময়মনসিংহের অভিভাষণে প্রকাশ করিয়াছি। ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন বা অন্য কোন বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও হইতে পারেন কি না, এবিষয়ে কোন উক্তি এযাবৎ আমার অভিভাষণে বা শাস্ত্র-সমস্যা প্রবন্ধে ছিল না। এরূপ অবস্থায় আমার মতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া এই বিচারের অবতারণা যিনি করিতে পারেন, তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বিচার করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিলে মানব-মাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে, এই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তই আমি বলিতেছি, সেই দীক্ষাদানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের অধিকার আছে কি নাই, এ বিষয়ে যখন আমি কিছুই এখনও বলি নাই, তখন প্রতিবাদকর্ত্তার এই বিচার 'ধান ভানিতে শিবের গীত' ছাড়া আর কি হইতে পারে? সুতরাং এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

তাহার পর এই বিচার দ্বারা তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে অভিমত নহে, প্রত্যুত তাহার বিরুদ্ধ, তাহাও দেখাইতেছি। "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধের প্রথম দফায় হরিভক্তিবিলাসধৃত এই শ্লোক দুইটী উদ্ধৃত হইয়াছে—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্বোদ্‌ঘাটক প্রতিবাদী এই দুই শ্লোকের যথাযথ অনুবাদের ফলে পাছে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরুতা ক্ষুণ্ন হয়, এইজন্য ভাবার্থমাত্র দিয়াছেন। প্রামাণিক সংস্করণে অনুবাদটী এইরূপ—উচ্চবংশে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও, বেদের সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও গুরু হইতে পারে না। যদি বৈষ্ণব না হয়েন অর্থাৎ বিষ্ণু-পরায়ণ না হইলে, দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না। উক্তগ্রন্থে পদ্ম-পুরাণের আর একটী বচনও ধৃত হইয়াছে, যথা—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্নস্যাদ্‌ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত ষট্‌কর্ম্মে দক্ষ, মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব গুরু হইতে পারে না, কিন্তু বৈষ্ণব বা বিষ্ণুপরায়ণ চণ্ডাল গুরু হইতে পারেন। এ বিষয়ে পদ্মপুরাণের অপর একটী বচন আরও সুস্পষ্ট, যথা—

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্‌।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ—বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎ-প্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুলোদ্ভূত ব্যক্তির গুরু। এই সকল শাস্ত্রবচনের মর্ম্ম বিবৃত করিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে কয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

এ বিষয়ে প্রচলিত বৈষ্ণবাচারের শাস্ত্রীয় ভিত্তি প্রদর্শনের জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে কি? আমাদিগের দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দীক্ষাদাতা গুরু যে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোভাবের পর হইতেই ব্রাহ্মণেতর বর্ণও হইয়া আসিতেছেন, তাহা কি প্রতিবাদকর্ত্তা এখনও শুনেন নাই? শ্রীখণ্ডের পরমভাগবত বৈদ্য গোস্বামিগণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু কায়স্থ-গুরু এখনও বহু কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশের দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দীক্ষিত শিষ্যগণ কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এখনও বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন বিনা বাধায় করিয়া আসিতেছেন। প্রায় চারি শত বৎসর হইতে চলিল, এইরূপ অব্রাহ্মণ-দীক্ষিত উচ্চকুলজাত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ সমাজের বরণীয় আসনে এখনও অবস্থিত আছেন, ইহা যিনি না জানেন, তিনি কি করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শিষ্টসম্মত কি সিদ্ধান্ত, তাহা খ্যাপন করিতে সাহস করেন, তাহা পাঠকমাত্রেই বিবেচনা করিবেন, এ স্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলার আবশ্যকতা দেখি না।

তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে ঋষিদিগের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিবার জন্য, তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই সকলের অসারত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব এক্ষণে দেখান যাইতেছে—

প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আত্মপাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য তাঁহার যে বলবতী প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধেও যেমন প্রকাশ পাইয়াছে —তৃতীয় প্রবন্ধেও তাহাই প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে পাঠকবর্গকে 'অতিষ্ঠ' করিয়া তুলিতেছেন, ইহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—"যে ভাবের প্রত্যুত্তর ও সমস্যা, তাহাতে মনে হয়, এ আলোচনা লোকের যত দিন বিরক্তিকর না হইবে, পাঠক 'অতিষ্ঠ' না হইবেন, তত দিন চলিবে! আমি দুই দিকে

চালাইব না, আমার মাথার মণি শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ, আমার যেন চির-আশ্রয় হইয়া থাকেন।”

এইরূপ গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে যে কি অপূর্ব্ব রসিকতা রহিয়াছে, পাঠকবর্গ নিজেরাই তাহার আস্বাদন করিবেন, আমি বিশেষ কিছু বলিব না। তবে এইটুকু বলিতে চাহি যে—“আমি দুই দিকে চালাইব না” ইহার অর্থ কি? এ কোন্ দুই দিক্? কে তাহা চালাইতেছে? তাহা যতক্ষণ প্রতিবাদকর্ত্তা খুলিয়া না বলিতেছেন, সে পর্য্যন্ত এরূপ উক্তি যে সুমার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক, তাহা শিষ্ট পাঠকগণ ভাল করিয়াই বুঝেন। “শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ” যে কেবল প্রতিবাদকর্ত্তারই মাথার মণি, তাহা নহে; সমগ্র হিন্দুজাতিরই মাথার মণি। তবে সে শাস্ত্র শুধু নিবন্ধকারগণের ব্যবস্থা নহে—এবং সে ব্রাহ্মণও গুণকর্ম্ম-বিহীন জাতি-ব্রাহ্মণ নহে। এইরূপ শাস্ত্রও ব্রাহ্মণকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়া হিন্দু-সমাজ বহু যুগ কাটাইয়াছে, ফলে সমাজের মাথা ও কবন্ধ উভয়ই কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বিশাল সমাজশরীর যদি আড়ষ্ট অচেতন এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাথার মণিও যে ধূলিতে লুঠাইতে থাকিবে—প্রতিবাদী যে আজও তাহা বুঝিতে অসমর্থ ইহাই বিচিত্র।

অজ্ঞানের বিষময় পরিণামে, পরম্পরাগত জীবিকা ও সম্মান রক্ষার বিষম লোভে পড়িয়া, যে সকল প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যবর্জ্জিত ব্রাহ্মণনামধারী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি অপব্যাখ্যার দ্বারা সনাতন-ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র-সমূহের মালিন্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই অপব্যাখ্যারূপ আপদ্ হইতে শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি “শাস্ত্র-সমস্যা” প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। শাস্ত্রের প্রতি তিনি যেরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আমার শ্রদ্ধা তাহা হইতে তিলমাত্রও ন্যূন নহে। তবে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা

ব্যক্তিরেকে শাস্ত্র রক্ষিত হইতে পারে না ইহাই আমার প্রতিপাদ্য। শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিবার যে রীতি কুমারিল ভট্ট, শবরস্বামী প্রভৃতি শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃ-গণ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমি সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছি, এবং যত দিন জীবন থাকিবে, সেই রীতিই আমার অবলম্বনীয় থাকিবে। ব্রাহ্মণ আমারও মাথার মণি, হিন্দু সভ্যতার যাহা কিছু সার, যাহা কিছু অনুকরণীয়, যাহা কিছু গৌরবাবহ, তাহা প্রায় সকলই ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজকে দিয়াছেন। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ—বড়ই দুঃখের বিষয়—বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যশক্তির জাগরণ ব্যতিরেকে এই অধঃপতিত পরপদলেহী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট মোহান্ধ হিন্দুজাতির পুনর্জীবনলাভ অসম্ভব, ইহা কে অস্বীকার করিবে? ব্রাহ্মণ আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউন, নিজের তপস্যার ও জ্ঞানের প্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় অসীম শক্তিসঞ্চয় করিয়া হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পথ সুগম করিয়া দিউন—ইহাই হইল শ্রীভগবানের নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। যথার্থ ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব হিন্দুসমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ময়মনসিংহের অভিভাষণে ইহাই আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি ও এখনও করিতেছি, সুতরাং ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রকে 'মাথার মণি' বলিয়া অতিরিক্ত দরদ দেখাইবার এবং তাদৃশ ঘোষণা দ্বারা আত্মগৌরব অনুভব করিবার অধিকার কেবল যে প্রতিবাদকারকেরই আছে, তাহা নহে।

প্রতিবাদকর্ত্তা তৃতীয় প্রবন্ধে 'বিপ্লবের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিয়া সনাতনধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয় যে ভাবে করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই পাঠকবর্গ শুনুন—"গতবার বলিয়াছি, প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন আমাদের ধর্ম্মসাধনা, এই প্রতিকূলে গমন যে কত কঠিন, তাহাও বলিয়াছি, এই কঠিনতা বশতঃই সমাজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত

হয়। প্রধান পুরুষগণের পদস্খলন দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত হইলে অনাচারের প্রসার হয়, প্রকৃতির প্রবর্ত্তন তাহার অনুকূল হইয়া থাকে।”

ধর্ম্মসাধনার এরূপ বিকৃতব্যাখ্যা প্রতিবাদকর্ত্তার উদ্ভটপাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। শোকমোহাদির বশে ক্ষাত্রধর্ম্মযুদ্ধে বিরত হইতে উন্মুখ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥

—গীতা ১৮ অঃ ৫৯ শ্লোক।

“অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ এইরূপ সঙ্কল্প যে করিতেছ, তোমার এরূপ সঙ্কল্প—মিথ্যা, যেহেতু, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে।”

এই ভগবদ্‌বাক্যের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্মাচরণে যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রকৃতির প্রতিকূল। প্রকৃতিই তাঁহাকে স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করাইবে। ইহাই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইল, তবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও ইহাই বুঝা গেল যে, প্রকৃতির অনুকূলভাবে গমন করিতে পারিলে ধর্ম্মসাধনা হইয়া থাকে, প্রকৃতির প্রতিকূলভাবে গমন ধর্ম্মহানিকর ও অধর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে। প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় কিন্তু, তাহা মানেন না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নেতৃত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনার যে স্বরূপ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। শ্রীভগবানেরও যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনভিমত—তাহা শ্রীভগবানের উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

এই শ্লোকে যে প্রকৃতিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন, তাহাও দেখা যাউক।

যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।

মধুসূদন সরস্বতীও 'প্রকৃতি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

প্রকৃতিঃ ক্ষত্রজাত্যারম্ভকো রজোগুণস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে।

আচার্য্য শঙ্কর প্রকৃতিশব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ক্ষাত্রস্বভাব'। মধুসূদন সরস্বতী আচার্য্য শঙ্করেরই মতানুসরণ করিয়া 'প্রকৃতি' শব্দের আরও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়-জাতির আরম্ভক যে রজোগুণস্বভাব, তাহাই 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ, 'সেই প্রকৃতি'ই অর্জ্জুনকে তাহার যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। উল্লিখিত আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মানবের যে স্বধর্ম্মাচরণ-প্রবৃত্তি, তাহা প্রকৃতি হইতেই হইয়া থাকে। 'প্রকৃতির' বিরুদ্ধে গমন করার নাম ধর্ম্মসাধনা, এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ প্রতিবাদকর্ত্তার অনভিজ্ঞতা ও হঠকারিতারই পরিচয় দিতেছে।

হইতে পারে, প্রতিবাদকর্ত্তা যে 'প্রকৃতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ তাঁহারই 'মনগড়া' কোনরূপ 'প্রকৃতি' হইবে, যাহার সহিত গীতোক্ত এই 'প্রকৃতির' সম্বন্ধ নাই; সেই 'প্রকৃতি' আমার মনে হয়, তাঁহার বুদ্ধির বিকৃতি ব্যতিরিক্ত আর কিছু নহে। গীতাতে বহুস্থলেই এই 'প্রকৃতি' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; প্রতিবাদকর্ত্তার 'প্রকৃতি' কিন্তু সেই সকল 'প্রকৃতি' হইতে ভিন্নরূপ। গীতার সপ্তম অধ্যায়েও দুই প্রকার প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

—গীতা ৭অঃ ৪।৫ শ্লোক,

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টধা-বিভক্ত আমার প্রকৃতি। এই প্রকৃতি—অপরা প্রকৃতি। ইহা হইতে অন্য আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহা পরা প্রকৃতি, তাহার নাম—জীব। সেই জীবরূপ পরা প্রকৃতি স্বকর্ম্মদ্বারা এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

গীতার এই দুইটি শ্লোকে যে দ্বিবিধ প্রকৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দ্বিবিধ প্রকৃতির প্রতিকূল গমনের নাম যদি প্রতিবাদকর্ত্তার অভিমত ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলেও প্রতিবাদকর্ত্তার এই উক্তি অসংলগ্ন প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। কেন তাহা বলি,—

'অপরা প্রকৃতি' শব্দের অর্থ হইতেছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই অষ্টবিধ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গমন করিলেই ধর্ম্মসাধনা হয়, ইহাই যদি প্রতিবাদকর্ত্তা বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হয়, মনের বিরুদ্ধে যে গতি, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যে গতি, তাহার নাম—ধর্ম্মসাধনা। অহঙ্কারের অর্থাৎ 'আমি' এই প্রকার নিশ্চয়ের বিরুদ্ধে যে গতি, প্রতিবাদকর্ত্তার মতে তাহাই ধর্ম্মসাধনা, কিংবা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের বিরুদ্ধে যে গমন, তাহাও প্রতিবাদকর্ত্তার মতে ধর্ম্মসাধনা। অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহেন—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিরুদ্ধে গমন বা অসীম শক্তিশালী পঞ্চভূতের বিরুদ্ধে যে গমন, তাহাই তাঁহার মতে ধর্ম্মসাধনা। ধর্ম্মসাধনার এই অপূর্ব্ব অপব্যাখ্যা হিন্দু

কখনও শুনে নাই, কোন শাস্ত্রেও ইহা নাই। মানুষ নিজের মনের, নিজের বুদ্ধির এবং নিজের অহংজ্ঞানের বিরুদ্ধে চলিতে পারে না, এ পর্য্যন্ত কেহ চলেও নাই; কখনও যে কেহ চলিবে, তাহাও সম্ভবপর নহে, অথচ প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় স্বভাবনিয়ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জীর্ণোদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, হে অধর্ম্মনিরত কলিযুগের ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুগণ! তোমরা নিজের মনের, নিজবুদ্ধির ও নিজ অহং-প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে চল, তাহা হইলেই তোমাদের ধর্ম্মসাধনা হইবে। আর যদি তাহার বিরুদ্ধে না চলিয়া তাহার অনুকূলভাবে চল, তাহা হইলে তোমরা অধার্ম্মিক হইবে—তোমাদের অধোগতি হইবে!

অপরা প্রকৃতির মধ্যে পঞ্চভূতেরও উল্লেখ আছে, তাহার বিরুদ্ধগতি যদি ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলে সাধক যে একক্ষণও জীবিত থাকিতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। প্রতিবাদ-কর্ত্তার তাহাই যদি ইষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অচিরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ার নামই সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মসাধনা। বলা বাহুল্য, এ ধর্ম্মসাধনা যিনি সমাজকে শিখাইতে চাহেন, তাঁহার উক্তি বিভ্রান্তের উক্তি ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে? তাহার পর পরা প্রকৃতির কথাও ঐ গীতার শ্লোকে দেখিতে পাই। সে পরা প্রকৃতি হইল জীব। জীবের—আত্মার বিরুদ্ধে যে গতি, প্রতিবাদকর্ত্তার মতে তাহাই যদি ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্মসাধনায় কোন হিন্দুরই কোন কালে প্রবৃত্তি ছিল না—হইতেও পারে না। আত্মার আত্মবিরুদ্ধ গতি ধর্ম্ম-সাধনা, এ কথা হিন্দুর নিকটে—আত্মোপাসকের নিকটে কিছুতেই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতির স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সাংখ্যদর্শনোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তিশালিনী জীব-

নিবহের ভোগাপবর্গসম্পাদিকা—প্রকৃতির বিরুদ্ধে গমন করাই যদি প্রতিবাদকর্ত্তার অভিমত ধর্ম্মসাধনা হয়, তাহা হইলেও বলিব, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাংখ্যদর্শনেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে এ পর্য্যন্ত কেহ যায় নাই, যাইতে পারেও না। এরূপ অবস্থায় প্রতিবাদকর্ত্তার বিচিত্র 'প্রকৃতি' অশ্বডিম্ব ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে—তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই বিচার করিয়া দেখুন। এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিব না, প্রতিবাদকর্ত্তা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার এই বিচিত্র 'প্রকৃতিটি'কে সাধারণের সমক্ষে কখনও উপস্থিত করেন, তখনই আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ফল কথা এই হইতেছে যে, হিন্দুর দর্শনে, হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে, হিন্দুর অভিধানে, প্রকৃতিশব্দের যত প্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিবাদকর্ত্তার এ 'প্রকৃতি' তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না : এ নূতন প্রকৃতির স্বরূপ যদি প্রতিবাদকর্ত্তা দেখান, তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব।

প্রতিবাদকর্ত্তা লিখিতেছেন—"সনাতন ধর্ম্ম নিবৃত্তিপ্রধান।" কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণঃ নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" প্রবৃত্তিলক্ষণ যে ধর্ম্ম, তাহাতে প্রবৃত্তিই প্রধান, ইহা শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্করের উক্তির দ্বারাও তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সকল ধর্ম্মকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বলা যায়। এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মে নিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, কিন্তু প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য আছে। নিবৃত্তিলক্ষণ সন্ন্যাসাদি ধর্ম্মেই নিবৃত্তির প্রাধান্য আছে, প্রবৃত্তির প্রাধান্য নাই। এই ভাবে ধর্ম্মের বিভাগ আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মমাত্রই নিবৃত্তিপ্রধান—ইহা এ পর্য্যন্ত কোন আচার্য্য কোন

গ্রন্থেই বলেন নাই, সুতরাং ইহা প্রতিবাদকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। নিবৃত্তিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহাই হইল শিষ্টগণের সিদ্ধান্ত; ইতিহাসও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ প্রকৃতস্থলে শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তি। এ সংসারে বহুল-দুঃখমিশ্রিত সুখ দৃষ্ট-উপায়ের দ্বারা সাধিত হয়, অথচ তাহা নিতান্ত অচিরস্থায়ী, এই কারণে আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস-সম্পন্ন আস্তিক ব্যক্তিগণ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত চিরস্থায়ী সুখের সাধনস্বরূপ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হন। সেই সকল কর্ম্মকেই প্রবৃত্তিপ্রধান কর্ম্ম বলা যায়। এই সকল কর্ম্ম করিতে হইলে যেরূপ প্রবৃত্তির আবশ্যকতা হয়, তাহা উচ্ছৃঙ্খল হইতেই পারে না। শাস্ত্র উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তির নিরাকরণের জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকে। শুধু শাস্ত্র কোন—লোকেও এই প্রকার প্রবৃত্তির উচ্ছৃলতা নিবারণের জন্য কর্ম্মিগণের সাবধানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদরান্নের জন্য পরের চাকরী করিতে গেলেও চাকরী করিবার সময়, চাকরের প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যথেচ্ছ প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না, সেরূপ করিতে গেলে তাহার চাকরীরূপ জীবিকাই নষ্ট হয়, এই কারণে তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিতেই হয়। এইরূপ প্রবৃত্তিসঙ্কোচ চাকরের আছে বলিয়া, তাহার চাকরীকে যে নিবৃত্তিপ্রধান কর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ কোন হেতু দেখা যায় না।

এইরূপ লৌকিক কার্য্যমাত্রেই সর্ব্বতোমুখী প্রবৃত্তির সঙ্কোচ যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে হইলেও সেই কার্য্যের অনুকূল প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিতে হয় এবং অন্যপ্রকার প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্তি ও লৌকিক

কার্য্যে প্রবৃত্তির মধ্যে কোন বৈষম্যই বিদ্যমান নাই। লৌকিক কার্য্য করিতে গেলে সংযমের আবশ্যকতা আছে, শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে গেলেও সংযমের আবশ্যকতা আছে বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মকে যদি প্রতিবাদকর্ত্তার মতানুসারে নিবৃত্তিপ্রধান বলা যায়, তাহা হইলে লৌকিক কার্য্য করিতে গেলেও সংযমের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, লৌকিক কার্য্যও নিবৃত্তি-প্রধান হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে লৌকিক কার্য্যের ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের নিবৃত্তিপ্রধানতা তুল্যভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ শাস্ত্রীয় কার্য্য নিবৃত্তিপ্রধান, লৌকিক কার্য্য নিবৃত্তিপ্রধান নহে, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা নিতান্ত অসার, নির্যুক্তিক ও সাধারণজনের ভ্রান্তির উৎপাদক হইয়া থাকে। এই ভাবে নিবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম লইয়া প্রতিবাদ-কর্ত্তা যে বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছেন, তাহা বিবেচকগণের নিকট একান্ত উপেক্ষণীয় বলিয়াই প্রতীত হইবে।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ ধর্ম্মেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম, অপর প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। অধিকতর সুখভোগাদির কামনায় যে কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কামনায় যে কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ বা প্রবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকগণই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্যগণের নিকট কোন দিনই এই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত আদৃত হয় নাই, প্রত্যুত উপেক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুর সকল ধর্ম্মকেই নিবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া যিনি নির্দ্দেশ করেন, তিনি বৌদ্ধসিদ্ধান্তেরই প্রচার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মকে আকুল করিয়া থাকেন, ধর্ম্মবিপ্লবের পথকে উন্মুক্ত করেন—এক কথায় বলিতে গেলে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর নিকট প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াই তিনি পরিগৃহীত হইবার যোগ্য।

শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেই এইরূপ মতকে চিরদিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং এখনও যে করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে—'মানুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে না, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ই সর্ব্বজ্ঞ' এই যে সিদ্ধান্ত আমি 'শাস্ত্র-সমস্যায়, উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপর প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা কিছু বলিয়াছেন, সে সকল যে নির্যুক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই দেখান হইতেছে।

বুদ্ধ প্রভৃতি অসাধারণ পুরুষগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করাই কুমারিল ভট্টের অভিমত, মন্বাদি মহর্ষির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন তাঁহার অভিমত নহে, সুতরাং বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডনপর কুমারিল ভট্টের বচনাবলী শাস্ত্র-সমস্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদকর্ত্তা আমার প্রতি যে মিথ্যা-বাদিতা, প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা—তিনি কুমারিল ভট্টের বাক্যসমূহ ও তদন্তর্নিহিত যুক্তি ও প্রমাণের স্বরূপ নিজে যে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। মনুষ্যমাত্রের সর্ব্বজ্ঞতা-নিরাকরণই যে কুমারিল ভট্টের অভিমত, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'শাস্ত্র-সমস্যায়' আমি যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই—

সর্ব্বজ্ঞোঽসাবিতি হ্যেব তৎকালে তু বুভুৎসুভিঃ।
তজ্জ্ঞানজ্ঞেয়বিজ্ঞানরহিতৈর্গম্যতে কথম্॥ ১৩৪
কল্পনীয়াশ্চ সর্ব্বজ্ঞা ভবেয়ুর্বহবস্তব॥
য এব স্যাদসর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্বজ্ঞং ন বুধ্যতে॥ ১৩৫
সর্ব্বজ্ঞোঽনববুদ্ধশ্চ যেনৈব স্যান্ন তং প্রতি।
তদ্বাক্যানাং প্রমাণত্বং মূলাজ্ঞানেঽন্যবাক্যবৎ॥ ১৩৬

ইহার অনুবাদও আমি যাহা 'শাস্ত্র-সমস্যায়' করিয়াছি, তাহা এই—

"কোন্ মানুষ সর্ব্বজ্ঞ—ইহা সেই মানুষ যখন বিদ্যমান থাকে, তৎকালে লোক কি প্রকারে বুঝিবে? যাহারা তাহার সর্ব্বজ্ঞতা বুঝিতে চাহে, এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহার সাহায্যে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। যাহারা সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহারা যাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অনুমান করিবে, তাহার সেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান কি-স্বরূপ, এবং সেই জ্ঞানের বিষয় যে কোন্ কোন্ বস্তু, তাহা তাহারা নিজেই বুঝে না, এইরূপ ব্যক্তিগণ অপরের সর্ব্বজ্ঞতাবিষয়ক অনুমান কোন্ হেতুর সাহায্যে করিতে পারে? সর্ব্বজ্ঞতারূপ সাধ্যের সাধক কোন হেতুই অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করিবে, তাহারও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাহাই যদি মানুষের সর্ব্বজ্ঞতাবাদিগণের ইষ্ট হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয় যে, এ সংসারে সর্ব্বজ্ঞ এক জন নহেন, যাঁহারা অপরের সর্ব্বজ্ঞতার অনুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। কারণ, অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কখনই সর্ব্বজ্ঞের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যাহার সর্ব্বজ্ঞতা অনুভব করিতে পারে না, সে ব্যক্তি তাহার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না, এবং সেই কারণে এইরূপ কল্পিত সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অলৌকিক বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়া থাকেন, তাহার কোন মূল প্রমাণ না থাকায়, সেই সকল বচনের উপর প্রামাণ্য-বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব।"

কুমারিল ভট্ট এই কয়টি শ্লোকে বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিবার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যদি বাস্তবিকই বুদ্ধ প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যুক্তিরই সাহায্যে মন্বাদিরও সর্ব্বজ্ঞতা কেন খণ্ডিত হইবে না, তাহার উত্তর প্রতিবাদকর্ত্তা কিছুই বলেন নাই। তিনি কেবল দেখাইয়াছেন

যে, এই শ্লোকে 'অসৌ' এই যে শব্দটি আছে, তাহা পূর্ব্ব-প্রক্রান্ত বুদ্ধকেই বুঝাইতেছে, সুতরাং বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডনই কুমারিল ভট্টের অভিমত, মনু প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন তাঁহার অভিমত নহে। ইহার উপর আমার বক্তব্য এই যে, অপরের সর্ব্বজ্ঞতা কাহারও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে, অনুমানের সাহায্যেই তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেই অনুমান করিতে হইলে যেরূপ সাধ্য ও হেতুর নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, তাহারই খণ্ডন করা কুমারিল ভট্টের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। মন্বাদি মহর্ষির সর্ব্বজ্ঞতাও আমাদিগের কাহারও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, সুতরাং মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিতে হইলে, আমাদিগকেও অনুমানের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষের সর্ব্বজ্ঞতার সাধক কোনরূপ প্রমাণই যে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, এই সকল শ্লোকে তাহা কুমারিল ভট্ট অতি বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্টের সেই সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডনপর অনুমানপদ্ধতির খণ্ডন, প্রতিবাদকর্ত্তা যে পর্য্যন্ত না করিবেন, সে পর্য্যন্ত, তাঁহার মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্য যত কিছু প্রয়াস, সবই অরণ্যে রোদন ব্যতিরিক্ত আর কিছুই হইতে পারে না।

কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকাচার্য্যগণ যে কারণে বুদ্ধ প্রভৃতি বেদ-বিরুদ্ধবাদিগণের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই প্রতিবাদকর্ত্তা কুমারিল ভট্টের এ কয়টি শ্লোকের অসম্ভব বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মীমাংসক আচার্য্যগণ সকলেই এক-বাক্যতা-সহকারে ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইয়া থাকে। যাহা বেদমূলক নহে, এমন কোন পৌরুষেয় বাক্যই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে সমর্থ নহে, কারণ, কোন পুরুষের এরূপ সহজ শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে সে কি ধর্ম্ম বা কি অধর্ম্ম, তাহা

নির্ণয় করিতে পারে। সুতরাং শাশ্বত বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে স্মৃতিনামে প্রসিদ্ধ মন্বাদি মহর্ষি-প্রণীত শাস্ত্রের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য থাকে না। এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, স্মৃতিরূপ পৌরুষেয় বচননিবহ শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মেরই স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিয়া ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের সাক্ষাৎ প্রামাণ্য না থাকিলেও তত্তদ্ ধর্ম্মে প্রমাণভূত বেদবাক্যের অনুমান আমরা স্মৃতির সাহায্যে করিয়া থাকি বলিয়াই স্মৃতিকেও আমরা ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। মন্বাদি মহর্ষিগণ শ্রুতিপাদিত অর্থই প্রাতপাদন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের মত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। শ্রুতি যাহা প্রতিপাদন করেন নাই, সেইরূপ কোন ধর্ম্ম যদি মন্বাদি মহর্ষি প্রতিপাদন করিতেন, তাহা হইলে তাহা কখনই ধর্ম্ম বলিয়া শিষ্ট-সমাজে অঙ্গীকৃত হইত না—এই প্রকার মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, তোমার আমার ন্যায় সাধারণ পুরুষ অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ নহে—ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বুদ্ধদেব ত তোমার আমার ন্যায় সাধারণ পুরুষ ছিলেন না, তিনি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সর্ব্বজ্ঞতাই তাঁহার এই অসাধারণ পুরুষত্বের হেতু। সেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকল বস্তুই যখন জানিতেন, তখন কি ধর্ম্ম ও কি অধর্ম্ম, তাহাও তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি যাহা নিজে সর্ব্বজ্ঞতার প্রভাবে বুঝিয়া ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে ধর্ম্মই হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই—এইরূপ বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিবার জন্যই কুমারিল ভট্ট বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন। যে সকল যুক্তির সাহায্যে তিনি বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন, মন্বাদি মহর্ষির সর্ব্বজ্ঞতাও তাহার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই খণ্ডিত হইয়াছে। যে সকল

যুক্তি দ্বারা বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে— প্রতিবাদকর্ত্তা যদি সেই সকল যুক্তির অসারতা বা দুষ্টতা বিচারের দ্বারা ব্যবস্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুদ্ধেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইয়া যায়, আর যদি সেই সকল যুক্তিকে তিনি অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মনু প্রভৃতিরও সর্ব্বজ্ঞতা তাহা দ্বারাই খণ্ডিত হইবে। জিদের বশে একটি অদ্ভুত আজগুবি মত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি এই "উভয়তঃ পাশা"-রজ্জু নিজের গলদেশে লাগাইয়া ঝুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন। ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কি উপায় তাহা তিনি পারেন ত' আবিষ্কার করুন।

তিনি যে জিদের বশে মনু প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের কথাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে; কারণ, তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি নিজের মুখেই বলিয়াছেন— "'সর্ব্বজ্ঞতা মন্বাদির ছিল না' কুমারিলের এই মত যদি কেহ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেও জ্ঞানপূর্ব্বক আমি তাহা মানিব না; কারণ, ঋষি অপেক্ষা কুমারিলের কথা অধিক মান্য নহে। ঋষিবাক্য যেখানে কুমারিলের প্রতিকূলে, সেইখানে ঋষিবাক্যই মানিব, কুমারিলের বাক্য মানিব না।" ইহা জিদ্ ছাড়া আর কি হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই অবধারণ করুন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক কুমারিল ভট্ট সম্বন্ধে যখন এইরূপই বদ্ধ মনোভাব, তখন মীমাংসকাচার্য্যের পুঁথি হইতে তাঁহার মত আর উদ্ধৃত করা বৃথা। "নাবুঝকে বুঝাবে কত বুঝ নাহি মানে।" তবে শিক্ষিত পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য একটী স্থল এখানে উল্লিখিত হইল। উহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিভাত হয় যে—কুমারিল ভট্ট বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু অতীত, অনাগত, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত

ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান বেদব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ হইতে অসম্ভব তাহাও তিনি সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক প্রভৃতি অলৌকিক বস্তু সকলের যথার্থ জ্ঞান মানুষের প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদি প্রমাণ হইতে অসম্ভব—এমন কি বেদ-নিরপেক্ষ যোগিপ্রত্যক্ষ বা আর্ষ-প্রত্যক্ষও যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না— তাহা শবরভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বিশদরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

লৌকিকী প্রতিভা যদ্বৎ প্রত্যক্ষাদ্যনপেক্ষিণী।
ন নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তা তথাস্যাদ্ যোগিনামপি॥

—শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষ সূত্র ৩২ শ্লোক।

অর্থাৎ—প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-নিরপেক্ষ লৌকিক প্রতিভা যেমন নিশ্চয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যোগীদিগের অলৌকিক জ্ঞান বা প্রাতিভ জ্ঞানও নিশ্চয়ের হেতু হইতে পারে না।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা শ্লোকবার্ত্তিকের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পার্থ সারথি মিশ্র যেরূপ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"বৈশেষিকাদয়স্তু প্রতিভাখ্যপ্রমাণান্তরগম্যত্বং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্মন্যন্তে। তচ্চ লোকেঽপি ক্বচিদস্ত্যেব যথা শ্বোমে ভ্রাতা আগন্তা'ইতি। বাহুল্যেন তদ্ ঋষীণামেব ইত্যার্ষ মিত্যুচ্যতে। তান্নিরাকরোতি লৌকিকীতি। অস্মদাদি প্রতিভা তাবল্লিঙ্গাদ্যাভাসজন্যা প্রত্যক্ষাদিকমনপেক্ষ্য স্বাতন্ত্র্যেণ অর্থমনিশ্চায়য়ন্তী নৈব প্রমাণম্ অতস্তদ্বদেব যোগিনামপি॥"

ইহার অর্থ—বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিভা নামক এক পৃথক্ প্রমাণ মানিয়া থাকেন। এই প্রতিভার স্ফুরণ কোন কোন স্থলে সাধারণ লোকের মধ্যেও হইয়া থাকে। যেমন হঠাৎ কেহ বুঝিয়া

থাকে বা বলে) কাল আমার ভ্রাতা আসিবে। এইরূপ প্রতিভা-প্রমাণবাদী বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত খণ্ডন করিবার জন্য বার্ত্তিককার 'লৌকিকী' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-নিরপেক্ষ ও দুষ্টহেতু প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন আমাদিগের প্রতিভা যেমন কোন বস্তুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যোগিগণের প্রতিভাও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে নিশ্চয় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।

এই উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহাই নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধ হইতেছে যে, কুমারিলভট্টের মতে বুদ্ধ ও যেমন অসর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, যোগী ও ঋষিগণও সেইরূপ অসর্ব্বজ্ঞই ছিলেন, সুতরাং বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতাই কুমারিল খণ্ডন করিয়াছেন, ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা তিনি খণ্ডন করেন নাই, প্রতিবাদ কর্ত্তার এই উক্তির একমাত্র ভিত্তি—তাঁহার কল্পনা অথবা বার্ত্তিকগ্রন্থ না দেখা ভিন্ন কিছু নহে। কুমারিলের এই মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন কোন্ ঋষিবাক্যের বিরোধ করিতেছে, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কুমারিল ভট্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই সর্ব্বশিষ্টসম্মত। কুমারিল নিজেই বুদ্ধ-প্রভৃতির সর্ব্বজ্ঞতা-খণ্ডন দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্থির। ইহাতেও যদি তিনি ঈশ্বরব্যতিরিক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, ইহা রক্ষা করিবার জন্য কুমারিল ভট্টকেও মানিব না বলিয়া আস্ফালন করিতে বিরত না হয়েন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার জিদ্ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মীমাংসাশাস্ত্র না পড়িয়া, মীমাংসকের কি সিদ্ধান্ত, তাহা না বুঝিয়া প্রতিবাদকর্ত্তা আমার প্রতি যে দোষাভাসের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার উদ্ভট বিচারকুশলতার সুন্দর পরিচয় দিতেছে।

'শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণে'র তৃতীয় সংখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"মীমাংসক মতের অনুবর্ত্তী 'সমস্যা'র রচয়িতার উক্তিতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাও যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; কারণ, মীমাংসক মতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে।" প্রতিবাদকর্ত্তা না জানিতে পারেন, কিন্তু মীমাংসক মতে ঈশ্বর—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যে স্বীকৃত—তাহা মীমাংসাগ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয়। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ "মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ" গ্রন্থেও লিখিত হইয়াছে,—

ন হি বেদঃ পুরুষনির্ম্মিতঃ।

বেদস্যাধ্যায়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকম্।
বেদাধ্যয়নসামান্যাদধুনাধ্যয়নং যথা॥

ইত্যাদিনা বেদাপৌরুষেয়ত্বস্য সাধিতত্বাৎ। যঃ কল্পঃ স কল্পপূর্ব্বঃ—ইতি ন্যায়েন তস্যানাদিত্বাৎ ঈশ্বরস্য চ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরো গতকল্পীয়ং বেদমস্মিন্ কল্পে স্মৃত্বা উপদিশতীত্যেতাবতৈব উপপত্তৌ প্রমাণান্তরেণার্থমুপলভ্য রচিতত্বকল্পনানুপপত্তেশ্চ।

এই উদ্ধৃত অংশে ঈশ্বর ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা মীমাংসকপ্রবর আপদেব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন; বহু মীমাংসাগ্রন্থেও এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টেরও ইহা সম্মত। সমগ্রভাবে ভট্টরচিত বার্ত্তিকগ্রন্থ আলোচনা করিলে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। প্রমাণ-স্বরূপ একটি স্থল এখানে উদ্ধৃত হইল—

যাশ্চৈতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বর-পরমাণু-কারণাদিপ্রক্রিয়াঃ সৃষ্টিপ্রলয়াদিরূপেণ প্রতীতাস্তাঃ সর্ব্বামন্ত্রার্থবাদজ্ঞানাদেব।

—তন্ত্রবার্ত্তিক—১ম অঃ ৩য় পাদ ২য় সূত্র।

অর্থাৎ—প্রকৃতি, পুরুষ, ঈশ্বর ও পরমাণুকারণাদি প্রক্রিয়া যাহা (অন্যান্য দার্শনিকগণ কর্তৃক) সৃষ্টি-প্রলয়াদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল মন্ত্রভাগ ও অর্থবাদভাগের জ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে। এবং পরবর্ত্তী মীমাংসক-ধুরন্ধরগণ ঈশ্বরবিষয়ে, যে সকল সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছেন, তাহা ভট্টকুমারিলের মতকে উপেক্ষা বা উচ্ছেদ করিয়া নহে—তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া। এখানে বিস্তৃতিভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইতেছে না, আবশ্যক বোধ হইলে তাহাও যথাসময়ে উদ্ধৃত করা যাইবে। স্বায়ম্ভুব মনুর মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব নাই, সুতরাং বর্ত্তমান মনুসংহিতার কর্ত্তা মনু মন্ত্রদৃক্ ঋষি নহেন, ইহাই আমি শাস্ত্রসমস্যায় দেখাইয়াছি। প্রতিবাদী এই মতের খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপ্সব মনু নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই আপ্সব মনুই যে স্বায়ম্ভুব মনু, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য বহু বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা দ্বারা স্বায়ম্ভুব মনুর বেদমন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

উপসংহার

—:*:—

আমার "শাস্ত্র-সমস্যা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ যে ভাবে হইতেছে, তদনুসারে বিচার চালাইলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি যে অনিবার্য্য, তাহা প্রতিবাদকর্ত্তা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ অপ্রাসঙ্গিক নিতান্ত বাজে কথার অবতারণা করিয়া স্বকৃত প্রবন্ধের বিস্তার করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। ছলে ও বলে আমারই উপর মিথ্যাবাদিতার ও লোক-প্রতারণার আরোপ করিয়া, তিনি নিজের সত্যপরতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য যে অতিশয় আগ্রহান্বিত, তাহা আমি পূর্ব্বেই বহুবার দেখাইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা বলিবার আর পৃথক্ আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ করি না।

তিনি নিজ প্রবন্ধে যে সকল গালি আমার উপর বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার উত্তররূপে—তাঁহারই প্রদর্শিত নীতি অনুসারে, তাঁহাকে ভূষিত করিবার যথেষ্ট অধিকার আমার থাকিলেও, সে কার্য্য হইতে আমি বিরত আছি ও থাকিব। কারণ, এইরূপ গালি দিয়া ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করিবার প্রয়োজন আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

শাস্ত্রীয় বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমার যে মতভেদ রহিয়াছে, তদ্‌বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এ পর্য্যন্ত তিনি এমন কোন প্রমাণেরই উপন্যাস করিতে পারেন নাই, যাহাতে আমার নিজ মতের অল্পমাত্রও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। প্রত্যুত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, তিনি নিজ

মত-সংস্থাপনের জন্য যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সকলই সারহীন, ইহাই আমার এই প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইতেছে।

তিনি প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছেন—মহাভারতের পূর্ব্বে, মহাভারতের সময় ও মহাভারত-রচনার পরবর্ত্তী কালে পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে 'পুরাণ' এই শব্দটি আছে, ইহা বলিয়াছেন। আমি দেখাইয়াছি যে, 'পুরাণ' এই শব্দটি রামায়ণেই আছে, তাহা নহে, শ্রুতির মধ্যেও 'পুরাণ' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণ বলিয়া প্রচলিত যে পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলি এখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই সকল পুরাণ ও উপপুরাণ যে মহাভারত-রচনার পূর্ব্বেও ছিল, তাহার কোন প্রমাণই প্রতিবাদকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই, কখনও যে করিবেন, সে আশাও সুদূরপরাহত, যেহেতু, বেদব্যাস-রচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও বহুসংখ্যক উপপুরাণ বেদব্যাসের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এ কথা তিনি শপথ করিয়া বলিলেও কেহ মানিবে না!

মহাভারতের পূর্ব্বে 'পুরাণ' নামে প্রথিত কোন প্রকার গ্রন্থ ছিল, ইহা আমিও মানি, কিন্তু সেই পুরাণ বর্ত্তমান সময়ে একখানিও নাই, ইহাই হইল আমার বক্তব্য। সুতরাং 'শাস্ত্র-সমস্যায়' সময়ভেদে শাস্ত্রও পরিবর্ত্তিত ও নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একালেও হইবে, ইহা দেখাইতে যাইয়া আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার কোনটিরই প্রতিবাদকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই, ইহা বিজ্ঞ পাঠকগণই দেখিবেন, সুতরাং আমি এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

রামায়ণ সম্বন্ধেও আমি বলিয়াছি যে, এখন যে রামায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই রামায়ণই যে মহাভারতের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার

কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বুদ্ধের নাম স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, বর্ত্তমানে প্রচলিত রামায়ণ বুদ্ধদেবের পরেই লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা যে সকল তাঁহার মনগড়া যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসার ও উপহাসাস্পদ। বুদ্ধদেব বলিলে যে শাক্যসিংহ বুদ্ধ ব্যতিরিক্ত আর কোন বুদ্ধকে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুর কোন শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট নাই, অমরসিংহের কোষেও বুদ্ধদেবের যে কয়েকটি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, অমরসিংহও ঐ সকল নাম শাক্যসিংহ বুদ্ধেরই নাম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বুদ্ধদেব যে অনেক ছিলেন, তাহা অমরসিংহও নির্দ্দেশ করেন নাই। বুদ্ধের বহুত্বের কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ রামায়ণে বুদ্ধের নাম দেখিলে ঐ বুদ্ধ যে শাক্যসিংহ ছাড়া আর কেহই হইতে পারেন না—তাহা হিন্দুমাত্রেই বুঝিয়া থাকেন, বা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বুঝিয়াও আসিতেছেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত প্রতিবাদকর্ত্তার সম্পাদিত রামায়ণের অনুবাদে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই যে, এই বুদ্ধ তথাগত বুদ্ধ—শাক্যসিংহ নহেন। এ উদ্ভট কল্পনা প্রতিবাদকর্ত্তাই প্রথমে করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন মূল প্রমাণ কিংবা টীকাকারের সম্মতিসূচক কোন প্রমাণই প্রতিবাদকর্ত্তা তৎকৃত রামায়ণের অনুবাদে উল্লেখ করেন নাই, এখন দায়ে পড়িয়া নিজের এই অদ্ভুত কল্পনাকে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে এ সকলই সম্ভবপর, কারণ, 'গরজ বড় বালাই'।

তাহার পর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, তিনি বঙ্গবাসীর পুরাণসমূহের

অনুবাদকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন, অথচ রামায়ণ সম্বন্ধে আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্রে যে কি লেখা আছে, তাহা তিনি যে জানেন নাই, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? লোককে ঠকাইবার জন্য শাস্ত্রের বহু প্রমাণ আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই উদ্ধৃত করি নাই বলিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট গালি বর্ষণ তিনি তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধেই করিয়াছেন, কিন্তু, নিজের মতের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া, তাঁহার নিজের সম্পাদিত পুরাণগ্রন্থনিচয়ে রামায়ণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। ইহা চাতুরী বা লোকবঞ্চনা অথবা সত্যের গোপন ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে, তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

আমি বলিয়াছি, এই রামায়ণখানি যে মহাভারতের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আমার এই প্রকার উক্তির কারণ হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণ-সমূহের মধ্যেই বহু রামায়ণ ও বহু বাল্মীকির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ২৪শ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভৃগুবংশীয় সুমতি নামে এক বিপ্র ছিলেন। কৌশিকী নামে তাঁহার এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র হয়। অনাবৃষ্টির সময় বিপদ্‌গ্রস্ত সুমতি ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে কাননে গিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। সেইখানে আভীর দস্যুগণের সহিত অগ্নিশর্ম্মার সঙ্গ হয়, তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। কোন সময়ে সপ্তর্ষিগণ ঐ পথে উপস্থিত হন। ঐ সপ্তর্ষির মধ্যে মহর্ষি অত্রি অগ্নিশর্ম্মাকে উপদেশ দিয়া দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। অগ্নিশর্ম্মা অত্রির উপদেশে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, এই তপস্যাকালে তাঁহার দেহের উপর বল্মীক উৎপন্ন

হইয়াছিল, ঋষিগণ আসিয়া পরে তাঁহাকে বল্মীকমুক্ত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "তুমি বল্মীকের মধ্যে ছিলে বলিয়া বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হইবে।" ঋষিগণের প্রস্থানের পর বাল্মীকি কুশস্থলীতে গমন পূর্ব্বক অতি মনোহর রামায়ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ রামায়ণই প্রথম কাব্য।

২। স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড বৈশাখমাস-মাহাত্ম্যে ২৯শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কৃণু-নামা জনৈক মুনি এক সরোবর-তীরে তপস্যা আরম্ভ কারন। দীর্ঘকাল তপস্যায় তাঁহার দেহ বল্মীক-মৃত্তিকায় আবৃত হিল। এই কারণে ঐ মুনি বাল্মীক নামে অভিহিত হন। তাঁহার ঔরসে এক শৈলূষীর উদরে এক বনেচর ব্যাধ জন্মগ্রহণ করে, ঐ বনেচর ব্যাধই ভূতলে বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হয়, এই বাল্মীকি দিব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে ১২৪ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মহামুনি বাল্মীকি পূর্ব্বে চৌর ছিলেন। পূর্ব্বকালে চমৎকারপুরের মাণ্ডব্য-বংশে লৌহজঙ্ঘ নামে জনৈক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। আনর্ত্তদেশে দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় দ্বিজ লৌহজঙ্ঘ মহাকষ্টে পতিত হইলেন। তখন তিনি ফলার্থী হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চৌর্য্যকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিলেন। দুর্ভিক্ষ দূর হইলে পরও অভ্যাস বশতঃ কিন্তু তিনি চৌর্য্যবৃত্তি হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। একদা মরীচি-প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ লৌহজঙ্ঘের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সপ্তর্ষিগণের অন্যতম পুলহ নামে ঋষি কহিলেন, 'তুমি আলস্য পরিহারপূর্ব্বক আমার প্রদত্ত এই মন্ত্র জপ কর।' তদনুসারে লৌহজঙ্ঘ সমাধিস্থ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই দীর্ঘকাল তপস্যাচরণে লৌহজঙ্ঘের চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ সঞ্চিত হইয়া তাঁহার দেহকে আবৃত করিয়াছিল, পরে লৌহজঙ্ঘ

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ নামক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

৪। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে ২৭৮ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে শমীমুখ নামে এক দ্বিজ ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বৈশাখ। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ করিবার জন্য বৈশাখ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। একদা সপ্তর্ষিগণকে ঐ পথে গমন করিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে লগুড় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন সপ্তর্ষির মধ্যে অঙ্গিরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি ক্ষণকাল অবস্থিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর'। তাঁহাদের নিকট পাপকর্ম্মের পরিণাম অতি ভীষণ, ইহা অবগত হইয়া, তিনি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েন এবং মুনিগণের উপদেশানুসারে মন্ত্র জপ করেন। ক্রমে বল্মীকে তাঁহার গাত্র আবৃত হইল, তখন ঋষিগণ আবার আসিয়া বলিলেন যে, 'হে মুনে! তুমি একাগ্রতা সহকারে মন্ত্র জপ করিয়া বল্মীকময় হইয়া পড়িয়াছ, এই কারণে জগতে তোমার বাল্মীকি এই নাম হইবে এবং তুমি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করিয়া মুক্ত হইবে'।

৫। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ২০৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, অসিত, দেবল, মহাতপা, বাল্মীকি এবং মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন।

৬। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ১২৪ সর্গে এইরূপ লিখিত আছে, প্রচেতার নন্দন বাল্মীকি ভবিষ্য ও উত্তরের সহিত এই আয়ুষ্য আখ্যান রচনা করিলে ইহা পিতামহ কর্ত্তৃকও অনুমত হয়।

৭। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভার্গব-শ্রেষ্ঠ বাল্মীকি রামচন্দ্র-চরিত রচনা করেন।

৮। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বল্মীক-সম্ভূত মহাযোগী বাল্মীকি ও বরুণের পুত্র।

৯। বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—চতুর্ব্বিংশ ভার্গববংশজাত ঋক্ষ বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হয়েন।

এই সকল পৌরাণিক ও মহাভারত কথার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, বাল্মীকি নামে বহু ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতে বাল্মীকির নাম আছে বলিয়া বাল্মীকি-প্রণীত বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, এইরূপ প্রতিবাদ-কর্ত্তার যে সিদ্ধান্ত, তাহার অনুকূল নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদ-কর্ত্তা দেখাইতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি, অর্থাৎ 'বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত রামায়ণ যে মহাভারত-রচনার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, ইত্যাদি, তাহা যে অবিসম্বাদিত সত্য, সুতরাং প্রতিবাদকর্ত্তা এই মদীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইবার স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব। আমি বলিয়াছি, মীমাংসকগণ স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী। এই স্বতঃ প্রামাণ্য শব্দের অর্থ এই যে, জ্ঞান যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারাই সেই জ্ঞানগত প্রামাণ্যও গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞান যদি স্বয়ং-প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সে যখনই আপনাকে প্রকাশ করে, তখনই তাহা স্বগত প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাভাকরগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলিয়া থাকেন, এই কারণে তাঁহাদের মতে প্রত্যেক জ্ঞানগত

প্রামাণ্য প্রত্যেক জ্ঞানের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভট্টমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে, তাহা জ্ঞাততালিঙ্গক যে জ্ঞানানুমান, তাহার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সুতরাং জ্ঞানগত প্রামাণ্য জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানবিষয়ক অনুমানের দ্বারাই প্রকাশিত হয়, ইহাই হইল ভট্টমতে স্বতঃপ্রামাণ্য। মুরারি মিশ্রের মতে জ্ঞান অনু-ব্যবসায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সুতরাং সে মতেও জ্ঞানবিষয়ক যে অনুব্যবসায়, তাহার দ্বারাই জ্ঞানগত প্রামাণ্যও প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের স্বপ্রকাশকত্ব সম্বন্ধে মীমাংসকগণের মতভেদ থাকিলেও স্বতঃপ্রামাণ্য বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এই স্বতঃপ্রামাণ্য বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক মীমাংসকের মত উদ্ধৃত না করিয়া অনায়াসে বুঝা যাইবে বলিয়া আমি প্রভাকরের মতই উদ্ধৃত করিয়াছি, কুমারিলভট্ট ও মুরারি মিশ্রের মত অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করি নাই। নৈয়ায়িকের ভাষায় বলিতে গেলে প্রামাণ্যের যে স্বতস্ত্ব, তাহা "স্বাশ্রয়গ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্ব", অর্থাৎ জ্ঞান যাহার দ্বারা গৃহীত হয় জ্ঞানগত প্রামাণ্যও তাহার দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী, তাঁহাদের সকলের মতই এইরূপ উক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, কঠিন হইবে বলিয়া এই নৈয়ায়িক-পরিষ্কৃত স্বতঃপ্রামাণ্য আমি মাসিক বসুমতীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উল্লেখ করি নাই। এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য, বেদ হইতে উৎপন্ন যে শব্দবোধাত্মক জ্ঞান, তাহাতেও বিদ্যমান আছে, ইহাই আমি উক্তপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আমার উক্তির অর্থ অনুধাবন না করিয়া প্রতিবাদকর্ত্তা পৌষ মাসের মাসিক বসুমতীতে লিখিয়াছেন—

"এতএব দেখা গেল—মাসিক বসুমতীর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মীমাংসকগণের কাহারও সম্মত নয়, প্রভাকরেরও নহে।"

আমার কথা না বুঝিয়াই যে এইরূপ উক্তি হইয়াছে, তাহা পাঠক-গণের বোধসৌকর্য্যার্থ আমি "শাস্ত্র-সমস্যায়" কি বলিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"জ্ঞান যে স্বভাব অনুসারে নিজের বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই স্বভাব অনুসারেই সে নিজের স্বরূপকেও প্রকাশ করে এবং নিজের উপর যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই হইল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। অর্থাৎ প্রকাশরূপ জ্ঞান একসঙ্গে ত্রিবিধ বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে। সে ঘটপটাদি বিষয়কে প্রকাশ করে, আপনাকেও প্রকাশ করে এবং আত্মগত যে যথার্থতা আছে, তাহাকেও প্রকাশ করে। ইহার নাম জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

মীমাংসকগণের মধ্যে গুরু বা প্রাভাকর নামে প্রসিদ্ধ যে দার্শনিক, তাঁহারা এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি বৈদান্তিক দার্শনিকগণও এই স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, মহর্ষি কপিল প্রভৃতি সাংখ্যচার্য্যগণও এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ মানিয়া লইয়াছেন।"

পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, আমি স্পষ্টই বলিয়াছি যে, মীমাংসকগণের মধ্যে প্রভাকর মতে আমার ব্যাখ্যাত স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে, ভট্ট ও মুরারি মিশ্রের মতে এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয়, এ কথা আমি বলি নাই। প্রভাকর মতেই এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয়, আমি ইহাই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। প্রতিবাদকর্ত্তা কিন্তু বলিতেছেন যে, এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য-বাদ প্রভাকরেরও অঙ্গীকৃত নহে। কেন নহে—তাহার কোন কারণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। এইরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য মীমাংসক প্রভাকর-সম্মত নহে- ইহা তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন, কিন্তু, ইহার

সাধক কোন প্রমাণেরই উপন্যাস তিনি করেন নাই, সুতরাং তাঁহার এইরূপ যে উক্তি, তাহা অপ্রমাণ ও উপেক্ষণীয়। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, আমার বর্ণিত এই স্বতঃপ্রামাণ্য প্রাভাকররূপ মীমাংসকগণের সর্ব্বথা সম্মত, প্রাভাকর মীমাংসকের মত তিনি বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়াছেন। তাঁহার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ মতের খণ্ডন করিবার প্রয়াস করুন, 'কস্বং' 'খস্বং' ·জাতীয় দাম্ভিকতাসূচক কটূক্তির দ্বারা তাঁহার নিজ পাণ্ডিত্য জাহিরের চেষ্টা বৃথা বাগাড়ম্বরমাত্র, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

পৌষের মাসিক বসুমতীতে তিনি লিখিয়াছেন, "বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্য ও জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য যে এক নহে, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল।"

আমি বলিতেছি, মীমাংসকগণের মতে বেদবাক্যজনিত জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য যে পৃথক্ পদার্থ, ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত, তাহা যে একইরূপ বস্তু, তাহাতে কোন মীমাংসকের মতভেদ নাই। প্রতিবাদকর্ত্তার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমার এই উক্তির যদি খণ্ডন করেন, তাহা হইলেই তাহার এই বৃথা আস্ফালন শোভা পায়, নচেৎ নহে।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য না মানিলে জ্ঞানের প্রামাণ্য-নির্ণয়ে অনবস্থার আপত্তি হয় বলিয়া আমি নৈয়ায়িক মতের দোষ উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসক মতের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছি, এবং সেই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের মতের প্রতি মীমাংসকমতাবলম্বনে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদকর্ত্তা কিছুই বলিতে পারেন নাই,

সে দিক্ দিয়াও তিনি যান নাই। আমি এখনও তাঁহাকে বলিতেছি, ঐ সকল দোষের খণ্ডন না করিয়া বাঙ্গালা দেশে নৈয়ায়িকের প্রাধান্যের আড়ম্বর দেখাইয়া আমাকে গালি দিলে কোন ফলই হইবে না, প্রত্যুত এরূপ গালিদাতা যে প্রাসঙ্গিক বিচারে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, তাহাই বুঝা যাইবে।

প্রতিবাদকর্ত্তা আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"এই যে স্বতঃপ্রামাণ্য, ইহা জ্ঞানেই বিদ্যমান, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য ইহা নহে।"

প্রতিবাদকর্ত্তা এ স্থলে প্রমাণ শব্দটি 'প্রমা'-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়া এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা কেবল যে প্রমিতিই বুঝায়, তাহা নহে, কিন্তু প্রমিতির করণকেও 'প্রমাণ' বলা যায়। সুতরাং শব্দাত্মক বেদে যখন 'স্বতঃপ্রামাণ্য' এই শব্দের ব্যবহার হয়, তখন তাহার অর্থ হয় 'স্বতঃপ্রমিতিকরণত্ব'। এই স্বতঃ-প্রমিতি-করণত্বরূপ স্বতঃপ্রামাণ্য বেদেও বিদ্যমান আছে এবং মীমাংসকগণ যেখানে বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহারা স্বতঃপ্রমিতিকরণত্বরূপ স্বতঃপ্রমাণকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং আমি বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া যে কোন মীমাংসক-মতবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছি, তাহা নহে।

স্বতঃ-প্রমিতিকরণরূপ স্বতঃপ্রামাণ্যের মধ্যে স্বতস্ত্বরূপ যে বিশেষণ, তাহা প্রমিতিতেই অন্বিত হইয়া থাকে। প্রতিবাদকর্ত্তা পৌষের মাসিক বসুমতীতে একটি নিতান্ত আজগুবী কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বেদ যে স্বতঃপ্রমাণ সংজ্ঞায় অভিহিত, তাহার কারণ, বেদ স্বকৃত বিধিনিষেধের জন্য অন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না" ইত্যাদি।

মীমাংসাশাস্ত্রে যাঁহার যৎসামান্য জ্ঞানও আছে—তিনি কখনও এরূপ অসার কথা বলিতে পারেন না। "বেদ স্বকৃত বিধিনিষেধের জন্য" ইহার অর্থ কি? 'বিধি ও নিষেধ' বেদকৃত নহে, কিন্তু তাহা বেদেরই স্বরূপ, ইহাই মীমাংসক-সিদ্ধান্ত। এ কথাও যে সর্ব্বদর্শনপরমাচার্য্য প্রতিবাদকর্ত্তা জানেন না, অথচ তিনিই আবার বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর কলমের খোঁচা লাগাইয়া বাজীমাৎ করিতে পশ্চাৎপদ হন না, ইহা তাঁহাতেই শোভা পায়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু ইহা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসিই হাসিয়া থাকেন। মীমাংসান্যায়প্রকাশ নামক—মীমাংসার প্রথম পাঠ্য পুস্তকেও লিখিত হইয়াছে—"স চ বেদো বিধিমন্ত্র-নামধেয়-নিষেধার্থবাদাত্মকঃ।" অর্থাৎ সেই বেদবিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদস্বরূপ হইয়া থাকে—ইহাই মীমাংসকের সিদ্ধান্ত। তাহা না জানিয়াই প্রতিবাদকর্ত্তা বলিয়া বসিয়াছেন, "বেদ স্বকৃত বিধি-নিষেধের জন্য অন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা করেন না।" বিধি-নিষেধ যাহার স্বরূপ, সেই বেদ বিধি-নিষেধ করিয়া থাকে, এইরূপ যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার দার্শনিকতা যে অনন্য-সাধারণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ-বিচার প্রসঙ্গে তিনি আমার প্রতি দোষারোপ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় যে 'স্বতঃ' 'পরতঃ' কথা ব্যবহৃত হয়, স্বতঃপ্রমাণ স্থলেও সেই প্রকার অর্থই প্রবেশ করান হইয়াছে। স্বতঃ যে স্বকীয়েভ্যঃ, এই দার্শনিক ব্যাখ্যার সমাবেশ ইহাতে নাই। এখানে স্বতঃর 'সহজ' অর্থ খাটিতে পারে না, তাহার কারণ, দার্শনিকগণ জ্ঞাত আছেন" ইত্যাদি। সাধারণের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিবার জন্যই প্রতিবাদকর্ত্তার এই উক্তি। স্বতঃ শব্দের যে 'সহজ' এইরূপ অর্থ বাঙ্গালায় চলিত, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন? এবং আমি ঐরূপ অর্থে তাহা কোন স্থানেও ব্যবহার

করিয়াছি, তাহা যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদকর্ত্তা না দেখাইবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার এই উক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গৃহীত হইবে। ‘প্রমার স্বতস্ত্ব’ শব্দের অর্থ স্বাশ্রয়গ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্ব, ইহা নৈয়ায়িকগণও দেখাইয়াছেন, এই নৈয়ায়িকসম্মত অর্থ গ্রহণ করিয়াই আমি মীমাংসক-মতসিদ্ধ স্বতঃপ্রামাণ্যের স্বরূপ অগ্রহায়ণ মাসের বসুমতীতে দেখাইয়াছি। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই প্রতিবাদকর্ত্তা যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাতেই যে স্বতঃ শব্দের অর্থ সহজ, ইহাই বা প্রতিবাদকর্ত্তা কোথায় পাইলেন? স্বতঃ শব্দের ‘সহজ’ অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা প্রতিবাদকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। বাঙ্গালা ভাষায় যাহার জ্ঞান আছে, এরূপ কথা সে কিছুতেই বলিতে পারে না।

প্রতিবাদকর্ত্তা ঐ পৌষের বসুমতীতেই বলিয়াছেন—“সর্ব্বজ্ঞতা দ্বিবিধ, সাতিশয় ও নিরতিশয়। যে সর্ব্বজ্ঞতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্ব্বজ্ঞতা অপর কাহারো থাকে, সেই সর্ব্বজ্ঞতা সাতিশয়। যে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট, তাহাই নিরতিশয়। ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা সাতিশয় এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিরতিশয়। কারণ, ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা (ইহজন্মেরই হউক বা পূর্ব্বজন্মেরই হউক) তপস্যা দ্বারা অর্জ্জিত। তপঃসিদ্ধির পূর্ব্বে এই সর্ব্বজ্ঞতা থাকে না। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য বর্ত্তমান। ইহা কোনও কার্য্যবিশেষের ফল নহে, ইহাই সাতিশয় ও নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার প্রভেদ।”

প্রতিবাদকর্ত্তার মতে সর্ব্বজ্ঞতার অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের যে নিত্যতা, তাহাই নিরতিশয়ত্ব, আর সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের যে অনিত্যত্ব বা জন্যত্ব তাহাই সাতিশয়ত্ব। ইহাও সর্ব্বদর্শন-পরমাচার্য্যের অদ্ভুত দার্শনিকত্বের পরিচয় দিতেছে। কোন দার্শনিকই কিন্তু এরূপ

নিরতিশয়ত্ব বা সাতিশয়ত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রত্যুত ইহা যোগ-সূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাসের অনভিমত। কারণ, "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, "যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ, স চ পুরুষ-বিশেষঃ।" যে পুরুষবিশেষে জ্ঞানের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর তিনিই পুরুষবিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর। এই ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ লিখিয়াছেন, "ননু সন্তি বহবস্তীর্থ-করা বুদ্ধার্হতকপিলর্ষিপ্রভৃতয়ঃ। তৎ কস্মাৎ ত এব সর্ব্বজ্ঞা ন ভবন্তি, অস্মাদনুমানাৎ। ইত্যত আহ সামান্যেতি।"

ইহার অর্থ এইরূপ, "যে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতেছে, সেই অনুমানের দ্বারাই বহু শাস্ত্ররচয়িতা বুদ্ধ, আর্হত, কপিলঋষি প্রভৃতি যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইবে না কেন? এইরূপ শঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য ভাষ্যে 'সামান্য' ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।" বাচস্পতি মিশ্রের এই লেখার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অপর কোন মানবেরই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভবপর নহে। ইহাই সূত্র ও ভাষ্যকর্ত্তার অভিপ্রায়। সুতরাং জ্ঞানের সর্ব্ববিষয়কত্বই নিরতিশয়ত্ব এবং তদ্‌ভিন্নত্বই অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক ভিন্নত্বই জ্ঞানের সাতিশয়ত্ব। ইহা যোগসূত্রে ব্যাসভাষ্যে এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত টীকায় স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের নিত্যত্বই যে নিরতিশয়ত্ব এবং অনিত্যত্বই যে সাতিশয়ত্ব, এই প্রকার আজগুবী সিদ্ধান্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার গৃহজাত মধুবিদ্যার ন্যায় তাঁহারই উষ্ণমস্তিষ্ক-প্রসূত ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং আর এ বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক বোধ করি।

আর একটি কথা এই যে, সর্ব্বজ্ঞ শব্দের প্রয়োগ ঋষিগণকে লক্ষ্য করিয়াও শাস্ত্রে বহু স্থানে আছে, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞতা যে শ্রীভগবানের জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ক নহে, ইহাই আমরা বক্তব্য। সর্ব্বজ্ঞতা শব্দের অর্থ যে লোকজ্ঞতা, তাহাও আমার শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। চাণক্যসূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—"সর্ব্বজ্ঞতা লোকজ্ঞতা" ৪৮ সূত্র। এই সূত্রানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, ঋষিগণকে যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা লোকজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং শাস্ত্রেও ঋষিগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞশব্দের এইরূপ অর্থই করিতে হইবে।

প্রাচীন ঋষিগণের ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা তপস্যা বা যোগের প্রভাবে অনেক অলৌকিক বস্তু বুঝিতে সমর্থ হইতেন, ইহাই তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রবাদের হেতু। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান কেবল ঈশ্বরেরই আছে, এবং তাহা অনুমানগম্য নহে। কিন্তু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, শ্রুতিতে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত আর কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনেও কোন জীবেরই সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃত হয় নাই। বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডন করিবার জন্য কুমারিলভট্ট যে যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা জীবমাত্রেরই সর্ব্বজ্ঞতা খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কুমারিলভট্টও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার খণ্ডন করেন নাই। কারণ, তিনি শ্রুতি মানিতেন। শ্রুতিতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদিত হয় বলিয়াই তিনি তাহা খণ্ডন করেন নাই। কিন্তু জীবমাত্রেই যে অসর্ব্বজ্ঞ, তাহা তাঁহার উক্তির দ্বারা এবং বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞতা-নিরাকরণ যুক্তিসমূহের দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা কুমারিলভট্টের অভিপ্রেত

নহে, ইহাই আমি এখনও বলিতেছি। প্রতিবাদকর্ত্তাও মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতাসাধক কুমারিলভট্টের কোন উক্তিই উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া তিনি কুমারিলভট্টের দোহাই দিয়া মন্বাদির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সকলই নিষ্ফল হইয়াছে। কুমারিলভট্টের মতানুযায়িগণ মীমাংসক হইয়াও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন, এ কথা আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। সুতরাং আমি মীমাংসকমতাবলম্বী, অথচ ঈশ্বরও মানিতেছি, এইরূপ প্রতিবাদকর্ত্তার যে আমার প্রতি দোষারোপ, তাহার হেতু তাঁহার মীমাংসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

'শাস্ত্রসমস্যা' প্রবন্ধে আমি যে কয়টি কথা বলিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনটিরই সযুক্তিক প্রতিবাদ করিতে প্রতিবাদকর্ত্তা পারেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে তিনি নিজেই ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি তাঁহাতেই বিদ্যমান, তাঁহার মতের অনুসরণ যে না করে, সে 'অধার্ম্মিক' 'অশাস্ত্রজ্ঞ' ও 'মতলববাজ প্রবঞ্চক' এইরূপ গালাগালি তাঁহার প্রবন্ধের সার হইয়াছে।

প্রতিবাদকর্ত্তার সহিত বিচারের উদ্দেশ্যে আমি "শাস্ত্রসমস্যা" প্রবন্ধের সূত্রপাত করি নাই। আধুনিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কি ভাবে, বাহ্যতঃ বহুবার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও মূলতঃ অপরিবর্ত্তিত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বর্ত্তমান বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুসমাজে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে, তাহার উপায় অন্বেষণ ও নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যেই আমি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। প্রতিবাদকর্ত্তা উপযাচক হইয়া সে সঙ্কল্পে বাধাদান করিলে অগত্যা আমাকে তাঁহার সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে লিপ্ত হইতে হয়। বিচার ও প্রতিবাদ আমার প্রতিপাদ্যের অনীপ্সিত

অবান্তর প্রসঙ্গ মাত্র। বোধ করি, পাঠকবর্গেরও তাহা অনীপ্সিত। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষিত সমাজ এই বাদ-প্রতিবাদ বিষয়ে উদাসীন —এবং ক্রমে ইহা যে ভাবে দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অধীর হইয়া পড়িতেছেন। অথচ এ বিচারে আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হইল কি না—তাহা নিরূপণ করিবার ভার তাঁহাদিগেরই উপর ন্যস্ত। কারণ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থনিরপেক্ষ শিক্ষিত সমাজই এই আলোচনার মর্ম্ম ও পরিণতি বুঝিতে অধিকারী। আজ আস্তিক হিন্দুমাত্রের মনে সর্ব্বোপরি এই প্রশ্নই জাগিতেছে—ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবে কি না? রাষ্ট্রে ও অর্থসামর্থ্যে পরাভূত হিন্দুস্থান আদর্শ এবং ভাব-সম্পদেও প্রতীচীর পদাবনত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিবে কি না—প্রশ্ন আজ তাহাই। পৃথিবীময় যে ভাব ও আদর্শের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ করাল হইতে করালতর দাঁড়াইতেছে, তাহার মধ্যে আর্য্য সভ্যতাকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের মহনীয় ও মনোহর, সত্য ও সুন্দর রূপ লোক-লোচনসমক্ষে ফুটাইয়া তুলা প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের নানা খুঁটিনাটির তলে সাধারণ ধর্ম্মের যে শাশ্বত ভিত্তি—তাহাকে সুদৃঢ় করাই সমাজের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। সে ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া বিশেষ ধর্ম্মের প্রপঞ্চকে বজায় রাখার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ চেষ্টায় উদ্যত হইয়া প্রতিবাদকর্ত্তা শবরস্বামী ও সনাতন ধর্ম্মের অন্যতম উদ্ধারক কুমারিলভট্টকে প্রৌঢ়বাক্যনিপুণ অর্থাৎ সরল ভাষায় ধাপ্পাবাজ সাজাইতে প্রাণপণ করিয়াছেন—এবং "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখাই" ইহাই যাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী অদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক ভক্ত হরিদাসকে পাত্রান্ন-প্রদান ধর্ম্মধ্বজীর কপটাচারের দৃষ্টান্তে পরিণত করিয়াছেন। যেন সনাতন ধর্ম্মসেবী মহাপুরুষগণ প্রতিবাদকর্ত্তারই প্রতিবিম্বস্বরূপ হইয়া শুধু চাতুরী দ্বারা যুগে

যুগে ইহার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যের এই সকল কল্পিত বিকৃত চিত্র উপস্থাপনের ফলে হিন্দুসমাজ "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের" মহিমায় অভিভূত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবে, ইহা মনে করা মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। সমাজের পিতামহগণের অবমাননার অর্থ পিতৃপুরুষানুসৃত পক্ষের সমর্থন নহে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়াছে বা হইবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নামমাহাত্ম্যে ধর্ম্মনেতৃত্বের স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের বাক্যে ও কর্ম্মে, বিচারে ও আচারে প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ পাইতে সমাজ আজও আগ্রহান্বিত। সমগ্র সমাজের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ইহাই যোগসূত্র—নাড়ীর বন্ধন। তাহা ছিন্ন করিয়া, মাত্র শুষ্ক তর্কের জালে সমাজকে বাঁধিবার প্রয়াস বৃথা। অথচ প্রতিবাদকর্ত্তার বিচারশৈলী দেখিয়া মনে পড়ে 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের' সেই প্রথিত চরণটি—"স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্তি তে পণ্ডিতাঃ।" বর্ত্তমান লোক শিক্ষার যুগে, নবজাগ্রত সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ হিন্দুসমাজে এ জাতীয় পাণ্ডিত্যের দিন আর নাই—ইহা প্রতিবাদকর্ত্তা এখনও যদি বুঝেন তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব।

— সমাপ্ত —

বিষয় সূচী